৫

বৈদেশিক খাত

বৈদেশিক খাত বলতে আমরা সাধারণতভাবে অর্থনীতি বিদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনীতির সকল লেনদেনকেই বুঝে থাকি। এর মধ্যে পরে আমদানি রপ্তানি, বিদেশী পুঁজি বিনয়োগ, অন্য দেশে বাংলাদেশের পুঁজি ও শ্রম নিয়োগ ইত্যাদি। যেহেতু বিদেশী পুঁশি বিনিয়োগ ও বিদেশী শ্রম প্রেরণ ও "রেমিট্যান্স" উপার্জনের বিষয়টি আগেই আলোচিত হয়েছে সে জন্য এখানে এগুলো নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয় নি। আমরা প্রথম দেখিয়েছি বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ এবং বাণিজ্য ঘাটতির সমস্যা কিভাবে কমেছে-বাড়ছে। তারপর আলোচনা হয়েছে আমাদের আমদানি ও রপ্তানির গুণগত দিক। সেই সাথে আমাদের অর্থণৈতিক-নীতি ও ক্ষেত্রে কি ছিল, তার ভাল-মন্দ দিকও তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষে বাণিজ্য ঘাটতি পুরণে এবং সামগ্রিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছেঃ

□ **পাঠ-১. আমদানি-রপ্তানি ব্যবধান ঃ গতিপ্রবণতা**

□ **পাঠ-২. আমদানি বিন্যাস ঃ গতিপ্রবণতা**

□ **পাঠ-৩. রপ্তানি বিন্যাস ঃ গতি প্রবণতা**

□ **পাঠ-৪. আমদানি-রপ্তানি নীতি**

□ **পাঠ-৫. বৈদেশিক সাহায্যে**

পাঠ-৫.১ ঃ আমদানি-রপ্তানি ব্যবধান: গতি প্রবণতা

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- "বানিজ্যিক ঘাটতি" বা অন্য কথায় "আমদানি-রপ্তানি ব্যবধান" কি ভাবে মাপা হয়?
- বাংলাদেশে "বানিজ্যিক ঘাটতির" সাথে কোন অংকগুলো যোগ বিয়োগ করে "চলতি ব্যয় ঘাটতি" পরিমাপ করা হয়?
- ৮০ ও ৯০ এর দশকে "বানিজ্যিক ঘাটতি" এবং "চলতি ব্যয় ঘাটতির"র গুরুত্ব (জি.ডি.পি- র তুলনায়) কি ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল তার ঐতিহাসিক গতি-প্রবণতা।

স্বাধীনতার প্রথম পনের বছর ঃ

ড. মাহাবুব হোসেন ও অধ্যাপক এ.আর খান সংকলিত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে ১৯৮৬-৮৭ সাল পর্যন্ত আমদানি-রপ্তানি ব্যবধানের গতি প্রবণতার বিষয়ে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারি। সাধারণত: এই ব্যবধানটিকে জি.ডি.পির শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। যেমন ধরুন ৫.১ নং সারণীতে ১৯৮৬-৮৭ সর্বশেষ বছরের জন্য উল্লেখিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে সে বছর মোট আমদানির মূল্য ছিল ৭৩৮০০ মি. টাকা। আর ঐ একই বছর রপ্তানির (দ্রব্য খাতে) মূল্য ছিল ৩০১৩৫ মি. টাকা। সুতরাং আমদানি-রপ্তানি ব্যবধান যার অন্য নাম বাণিজ্যিক ঘাটতি (Trade Deficit) এর পরিমান দাঁড়ায় (৩০১৩৫-৭৩৮০০) = ৪৩৬৬৫ মি. টাকা। কিন্তু এই পরিমান ঘাটতি চলতি দামে হিসাব করা হয়েছে বিধায় তা অন্যান্য বছরের ঘাটতির সঙ্গে তুলনীয় নয়।

সারণী ৫.১ ঃ বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ঘাটতি: ১৯৭৩/৭৪-১৯৮৬/৮৭

বছর	রপ্তানির মূল্য (মি. টাকায়)	আমদানির মূল্য (মি. টাকায়)	বাণিজ্যিক ঘাটতি (মি. টাকায়)	বাণিজ্যিক ঘাটতি (জি.ডি.পি-র শতাংশ হিসাব)
১৯৭৩-৭৪	২৯৮৩(৬)	৭৩২০(১৪)	-৪৩৩৭	৮
১৯৭৫-৭৬	৫৫৫২	১৪৭০৩	-৯১৫১	.....
১৯৭৬-৭৭	৬৬৭০	১৩৯৯৩	-৭৩২৩	.....
১৯৭৭-৭৮	৭১৭৮(৫.১৩)	১৮২১৬(১৩.৩)	-১১০৩৮	৭.৯
১৯৮০-৮১	১১৪৮৪(৫.২০)	৩৭২৪৪(১৬.৯০)	-২৫৮০৪	১১.৭
১৯৮৬-৮৭	৩০১৩৫(৬.২১)	৭৩৮০০(১৫.২১)	-৪৩৬৬৫	৯.০

উৎস: ড. মাহাবুব হোসেন ও এ.আর খান, প্রাগুক্ত।

১৯৭৩-৭৪ সালে আমদানির অনুপাত ছিল তদানীন্তন জি.ডি.পি-র ১৪ শতাংশ। পক্ষান্তরে রপ্তানির আপেক্ষিক অনুপাত ছিল জি.ডি.পি-র প্রায় ৬ শতাংশ। সেই হিসাবে বানিজ্যিক ঘাটতির আপেক্ষিক অনুপাত ছিল প্রায় ৮ শতাংশ।

তুলনাযোগ্য পরিমাপের জন্য হয় আমরা একে স্থির মূল্যে হিসাব করতে পারি অথবা অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় হচ্ছে ঐ বছরের জি.ডি.পি কে ভিত্তি করে ঐ বছরের বাণিজ্যিক ঘাটতি জি.ডি.পি-র ১৫.২১ শতাংশ। পক্ষান্তরে রপ্তানির পরিমান ছিল মাত্র ৬.২১ শতাংশ। অতএব স্বাভাবিক ভাবেই বানিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ ছিল তদানিন্তন জি.ডি.পি-র ৯ শতাংশ। অনুরূপ ভাবে লক্ষ্য করা যায়

যে একদম শুরুর বছর ১৯৭৩-৭৪ সালে আমাদানির অনুপাত ছিল তদানীন্তন জি.ডি.পি-র ১৪ শতাংশ।

পক্ষান্তরে রপ্তানির আপেক্ষিক অনুপাত ছিল জি.ডি.পি-র প্রায় ৬ শতাংশ। সেই হিসাবে বাণিজ্যিক ঘাটতির আপেক্ষিক অনুপাত ছিল প্রায় ৮ শতাংশ।

৫.১ নং সারণীতে এ প্রদত্ত তথ্যাবলী থেকে সাধারণ ভাবে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো উপনীত হওয়া যায়;

১। স্বাধীনতার প্রথম পনের বছর বাংলাদেশের রপ্তানির মাত্রা গড়ে জি.ডি.পি-র মাত্র শতাংশের সমান বা তার নিচে উঠা নামা করেছে।

২। উল্লেখিত কালপর্বে বাংলাদেশের আমদানির আপেক্ষিক মাত্রা জি.ডি.পি-র ১৬ শতাংশের নিচে ওঠা নামা করছে।

সেই হিসাবে সাধারণ ভাবে বলা যায় যে ১৯৭৩/৭৪ থেকে ১৯৮৬/৮৭ পর্যন্ত কালপর্বে বাংলাদেশে "বানিজ্যিক ঘাটতি" ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে শেষাবধি জি.ডি.পি-র ১০ শতাংশের আসে পাশে ওঠা নামা করছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্বাধীনতার শুরু থেকেই দেখা যাচ্ছে যে রপ্তানি আয় দিয়ে আমদানি ব্যয়ের পুরোটা সংকুলান হচ্ছে না। বস্তুতঃ বাণিজ্যিক ঘাটতির যে পরিমাণ ৫.১ নং সারণীতে দেখানো হয়েছে তাতে "আমদানিকৃত সেবার" হিসাব যুক্ত করা হয় নি। যেমন বাংলাদেশের জনগণ বাইরে থেকে চিকিৎসার সেবা এবং শিক্ষা সেবা অর্জনের জন্য দেশে উপার্জিত আয়কে ডলারে রূপান্তরিত করে বাইরে নিয়ে ব্যয় করে থাকেন। এই ব্যয় ও রপ্তানি লব্ধ ডলার আয় দ্বারাই পূরণ করতে হয় সুতরাং সেবা বাবদ আমদানি ব্যয় পণ্য আমাদানির সঙ্গে যোগ করলে বাণিজ্যিক ঘটাতির মূল্যমান আরো বেড়ে যাবে। ড. মাহবুব হোসেন ও এ.আর খান প্রদত্ত হিসাবানুসারে এভাবে সংশোধিত "বাণিজ্য ঘাটতির" পরিমান ছিল ১৯৭৮-৭৯ সালে-১৭০৭৪ মি. টাকা (জি.ডি.পি-র ১০.৪৩ শতাংশ)। ১৯৮০-৮১ সালে -২৯৭৩১ মি.টাকা (জি.ডি.পি-র ১৩.৭৮ শতাংশ) এবং ১৯৮৪-৮৫ সালে -৪৫৫২৩ মি. টাকা (১১.৪৭ শতাংশ)। সুতরাং সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে, বাংলাদেশে স্বাধীনতার ১৫ বছর পর শেষাবধি প্রকৃত বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমান দাঁড়িয়েছিল গড়ে জি.ডি.পি-র ১২ শতাংশ। অবশ্য বাংলাদেশের জনগন বাইরে থেকে যেমন চিকিৎসা সেবা এবং শিক্ষা সেবা বা সমধর্মী অ-উৎপাদনমূলক সেবা (Non-factor services) গ্রহণ করেন তেমনি আবার "রেমিট্যান্স" হিসাবে দেশে প্রেরণ করেন। সুতরাং আমাদানির হিসাবে অ-উৎপাদন মূলক সেবা ক্রয়কে অন্তর্ভুক্ত করলে, রপ্তানির হিসাবে সেবা রপ্তানিলব্ধ আয় বা রেমিট্যান্সকেও অন্তর্ভুক্ত করে বাণিজ্যিক ঘাটতি নির্ণয় করা উচিৎ। এই ভাবে পরিমিত পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাপকে অনেক সময় "চলতি ব্যয় ঘাটতি" (Current Account Deficit) নামে অভিহিত করা হয়। আলোচ্য কালপর্বে বাংলাদেশে দ্রুতগতিতে মধ্যপ্রাচ্যে শ্রম সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সময় "রেমিটেন্সের" পরিমাণও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই তুলনায় সেবা আমদানি ব্যয় ছিল তুলনামূলক

ভাবে কম। ১৯৭৭-৭৮ সালে যেখানে মোট প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমান ছিল মাত্র ১০২ মি. ডলার, ১৯৮৬-৮৭ সালে যেখানে মোট প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমান ছিল মাত্র ১০২ মি. ডলার, ১৯৮৬-৮৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৬২০ মি. ডলার। গড়ে রেমিটেন্সের পরিমান ছিল ১৯৭৭-৮৬ কালপর্বে জি.ডি.পি-র প্রায় ৪ শতাংশের সমান। অতএব, দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে পণ্য ও সেবা খাতে যে ১২ শতাংশ ঘাটতির উদ্ভবের কথা আগে উল্লেখিত হয়েছে তার এক তৃতীয়াংশ রেমিটেন্সের টাকা দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ ঘাটতি শেষ পর্যন্ত জি.ডি.পি-র ৮ শতাংশ নেমে এসেছিল। স্বাভাবিক একটি প্রশ্ন হচ্ছে এই ৮ শতাংশ বাড়তি বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় কোথা থেকে সংস্থান হয়েছিল স্বাধীনতার প্রথম ১৫ বছরে বিদেশী বিনিয়োগ তেমন একটা ছিল না। সুতরাং এই ৮ শতাংশ ঘাটতি মূলত: পূরণ হয়েছিল বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহের মাধ্যমে। পরে এ বিষয় আমরা আরো বিস্তৃত আলোচনা করবো। একই বিষয়ে সমধর্মী আরেকটি গবেষনার তথ্যও নিচে তুলে ধরা হল। ড. সেলিম জাহান সংকলিত তথ্যানুযায়ী ১৯৭২-৭৫ স্বাধীনতার প্রথম ৩ বছরে গড় রপ্তানির অর্থমূল্য ছিল ৩৫৬ মি. ডলার বা জি.ডি.পি-র মাত্র ৫ শতাংশ। পক্ষান্তরে এই ৩ বছরে গড় আমদানির অর্থমূল্য ছিল ১০৩৬ মি. ডলার বা জি.ডি.পি-র শতাংশ। সেই হিসাবে ১৯৭২-৭৫ কালপর্ব বাণিজ্য ঘাটতির পরিমান ছিল গড়ে প্রতি বছরে ৬৮০ মি. ডলার বা জি.ডি.পি-র ৬ শতাংশ।

বাংলাদেশের জনগন বাইরে থেকে চিকিৎসার সেবা এবং শিক্ষা অর্জনের জন্য দেশে উপার্জিত আয়কে ডলারে রপান্তরিত করে বাইরে নিয়ে ব্যয় করে থাকেন। এই ব্যয়ও রপ্তানি লব্ধ ডলার আয় দ্বারাই পূরণ করতে হয়। সুতরাং সেবা বাবদ আমদানি ব্যয় পণ্য আমাদনির সঙ্গে যোগ করলে বাণিজ্যিক ঘাটতির মূল্যমান আরো বেড়ে যাবে।

নব্বই দশকে আমদানি-রপ্তানি ব্যবধানের গতিপ্রবণতা

৫.২ নং সারণীতে ৯০ দশকে আমদানি-রপ্তানি ব্যবধানের বছরওয়ারী তথ্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে।

বছর	আমদানি মি. টাকা (জি.ডি.পি-র শতাংশ)	রপ্তানি মি. টাকা (জি.ডি.পি-র শতাংশ)	বাণিজ্য ঘাটতি (জি.ডি.পি-র শতাংশ)
১৯৯০-৯১	১১১৮৭৭(১৪)	৬০২৭২(৭)	৭
১৯৯১-৯২	১৩২৭৫৬(১৫)	৭৪১৯৮(৮)	৭
১৯৯২-৯৩	১৩৮১৯৮(১৫)	৮৮২১৫(৯)	৬
১৯৯৩-৯৪	১৩৭৫৪০(১৩)	৯৮৭৩৯(১০)	৩
১৯৯৪-৯৫	২৩৪৫২৭(১৬)	১৩৯৬১৫(৯)	৭
১৯৯৫-৯৬	২৮১৪৩৩(১৭)	১৫৮৭৯০(১০)	৭
১৯৯৬-৯৭	৩০৫৮২২(১৭)	১৮৮৬৬(১১)	৬
১৯৯৭-৯৮	৩৪১৪০৮(১৮)	২৩৪৮২২(১২)	৬
১৯৯৮-৯৯	৩৯৮৪৮৯(১৯)	২৫৪৫০৬(১২)	৭

বাংলাদেশের জনগন বাইরে থেকে যেমন চিকিৎসা সেবা এবং শিক্ষা সেবা বা সহধর্মী অ-উৎপাদনমূলক সেবা গ্রহণ করেন তেমনি আবার উৎপাদনমূলক শ্রব বা সেবা তারা বাইরে বিক্রি করেন এবং সেই উপার্জনের একটি অংশ "রেমিট্যান্স" হিসেবে দেশে প্রেরণ করেন।

উৎস: বিবিএস (১৯৯৭) এবং আই এম এফ (১৯৯৭)

নোট: ১৯৯০-১৯৯৪ পর্যন্ত তথ্য বি.বি.এস (১৯৯৭) পকেট বুক থেকে সংকলিত।

১৯৯৪-৯৯ পর্যন্ত তথ্য আই. এম. এফ (১৯৯৭) থেকে সংকলিত।

বি.বি.এস এবং আই.এম.এফ এর দলিল থেকে এই তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। এগুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সঠিক হিসাবে ধরে নিলে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তবলীতে পৌঁছাতে পারি। প্রথমত: ৯০ দশকের প্রথমার্ধে সাধারণভাবে বাণিজ্যিক ঘাটতির আপেক্ষিক গুরুত্ব ছিল। ক্রমহ্রাসমান। ১৯৯০-৯১ সালে তা ৮০ দশকের তুলনায় বেশি হ্রাস পেয়ে ৭ শতাংশে নেমে আসে। এই প্রবনতা অব্যাহত থাকে ১৯৯৪-৯৫ পর্যন্ত। ১৯৯৩-৯৪ এ তা সর্বনিম্ন ৩ শতাংশে পরিণত হয়। এই পরিমাপটি হু-ব-হু সঠিক নাও হতে পারে যেহেতু এর ভিত্তি হচ্ছে সংশোধিত পরিমাপ, প্রকৃত পরিমাপ নয়। কিন্তু তারপরও মূল প্রবণতা ঠিকই ছিল। কিন্তু এই বাণিজ্যিক ঘাটতি হ্রাসের মূল কারণ ছিল আমদানির অস্বাভাবিক শ্লথ গতি যাকে অনেক অর্থনৈতিক মন্দার সামিল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। যদিও এই সময় অবশ্য রপ্তানির বৃদ্ধির হার ছিল বেশ ভাল। কিন্তু ১৯৯৫ এর পর আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি দ্রুত গতিতে আমদানির বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক ভাবে রপ্তানির শ্লথ গতি। ফলে বাণিজ্যিক ঘাটতি পুনরায় ১৯৯৮-৯৯ সালে জি.ডি.পির ৭ শতাংশে পরিণত হয়েছে। তবে ঐতিহাসিক বিচারে এই মাত্রার ঘাটতি ১৯৮৫-৯০ সালের অতীত গড় ঘাটতি মাত্রার তুলনায় অর্ধেকেরও কম।

১৯৯৫-এর পর দেশে দ্রুত গতিতে আমদানির বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক ভাবে রপ্তাণির শ্লথ গতি দেখা গিয়েছে। ফলে বাণিজ্যিক ঘাটতি পুনরায় ১৯৯৮-৯৯ সালে জি.ডি.পির ৭ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

৯০ দশকে "বাণিজ্যিক ঘাটতির" সঙ্গে সেবা খাতে নীট ঘাটতি যোগ করে এবং রেমিটেন্স বিয়োগ করে আমরা পুনরায় "চলতি ঘাটতি ব্যয়" (Current Account Due) নির্ণয় করতে পারি। তাতে দেখা যায় ১৯৯৪/৯৫-১৯৯৮/৯৯ এই পাঁচ বছরে গড়ে চলতি ঘাটতি ব্যয়ের হার ছিল জি.ডি.পির মাত্র ২ শতাংশেরও কম। বস্তুত: এই ঘাটতি হ্রাসে প্রধান অবদান এসেছে ক্রমবর্ধমান "রেমিট্যান্স" থাকে।

১৯৯৪/৯৫ সালে "রেমিট্যান্সের" পরিমাণ যেখানে ছিল ১১৯৮ মি. ডলার (জি.ডি.পি-র ৩.১৮ শতাংশ), ১৯৯৮-৯৯ সালে তার পরিমান বেড়ে দাঁড়ায় ১৭০৬ মি. ডলার (জি.ডি.পি-র ৩.৯৪ শতাংশ)। বস্তুত: ১৯৯৬/৯৭ সালের পর থেকে বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে যে "রেমিটেন্স" এসেছে তা প্রতি বছর প্রাপ্ত বিদেশী সাহায্যের চেয়ে বেশি (চিত্র ৫.১)।

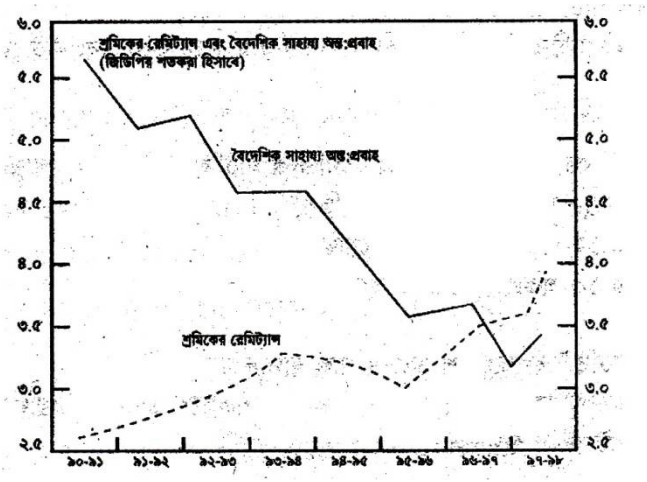

চিত্র : ৫১ : বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্য ও রেমিট্যান্সের বছরওয়ারী অন্ত:প্রবাহ

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে আমরা "বাণিজ্যিক ঘাটতি" সাধারণত: মেপে থাকি আমদানিকৃত পণ্যমূল্য থেকে রপ্তাণিকৃত পণ্যের মূল্য বিয়োগ করে। "চলতি ঘাটতি ব্যয়" মাপা হয় এর সঙ্গে নীট সেবা আমদানি ঘাটতি যোগ করে এবং রেমিট্যান্স বিয়োগ করে। গাণিতিক সূত্রানুযায়ী চলতি ঘাটতি ব্যয়= পণ্য খাতে নীট ঘাটতি + সেবা খাতে নীট ঘাটতি-বিদেশ থেকে প্রেরিত নীট আয়।

এই্ ভাবে ঘাটতি মেপে আমরা কালানুক্রমিক ভাবে তার প্রবণতা লক্ষ্য করে থাকি। বাংলাদেশে দেখা যায় স্বাধীনতার পর প্রথম ১৫ বছরের মধ্যে বাণিজ্যিক ঘাটতি জি.ডি.পির ১২ শতাংশে এবং চলতি ঘাটতি ব্যয় জি.ডি.পির ৮ শতাংশে উপনীত হয়। পরবর্তিতে ৯০ দশকে চলতি ব্যয় ২ শতাংশে নেমে আসে। তাই সাধারণভাবে বলা যায় যে ৮০র দশকের তুলনায় ৯০ এর দশকে ঘাটতি পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ঘাটতি মাপা হয়-

ক. আমদানির মূল্য থেকে রপ্তানির মূল্য বিয়োগ করে;

খ. রপ্তানির মূল্য থেকে আমদানির মূল্য বিয়োগ করে;

গ. আমদানির মূল্যের সঙ্গে রপ্তানির মূল্য যোগ করে।

২. "চলতি ব্যয় ঘাটতি" মাপা হয়-

ক. বাণিজ্যিক ঘাটতির সঙ্গে নীট সেবা আমদানি ব্যয় যোগ করে;

খ. বাণিজ্যিক ঘাটতির সঙ্গে নীট "রেমিট্যান্স" যোগ করে;

গ. বাণিজ্যিক ঘাটতির সঙ্গে নীট সেবা আমদানি ব্যয় যোগ করে এবং নীট রেমিট্যান্স বিয়োগ করে।

৩। বাংলাদেশে স্বাধীনতার প্রথম ১৫ বছরে বাণিজ্যিক ঘাটতি ক্রমশ: বৃদ্ধি পেয়ে-

ক. জি.ডি.পি-র ১৫ শতাংশে উপনীত হয়েছিল;

খ. জি.ডি.পি-র ১২ শতাংশে উপনীত হয়েছিল;

গ. জি.ডি.পি-র ১০ শতাংশে উপনীত হয়েছিল।

৪। "চলতি ব্যয় ঘাটতি" বাংলাদেশে ১৯৮৭ সাল নাগাদ কম বেশি-

ক. ৮ শতাংশে উপনীত হয়েছিল; খ. ১২ শতাংশে উপণীত হয়েছিল;

গ. ৬ শতাংশে উপনীত হয়েছিল।

৫। বাংলাদেশে ৯০ দশকে "বাণিজ্যিক ঘাটতি" ও "চলতি ব্যয় ঘাটতি" ৮০-র দশকের তুলনায় সাধারনভাবে

ক. বৃদ্ধি পেয়েছিল; খ. হ্রাস পেয়েছিল;

গ. একই রকম ছিল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। চলতি ব্যয় ঘাটতি ও বাণিজ্যিক ঘাটতির মধ্যে পার্থক্য কি?

২। বাংলাদেশে "চলতি ব্যয় ঘাটতি" কেন "বাণিজ্যিক ঘাটতির" তুলনায় সব সময় কম হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. বাংলাদেশে ৯০ দশকে বাণিজ্যিক ঘাটতির আপেক্ষিক অনুপাত (জি.ডি.পি-র তুলনায়) কেন দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল তা আলোচনা করুন।

২. বাংলাদেশের "বাণিজ্যিক ঘাটতি" স্বাধীনতার পর কখন সব চেয়ে উঁচুতে পৌঁছায়?

পাঠ-৫.২ ঃ আমদানী বিন্যাস : গতি প্রবণতা

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- বাংলাদেশের আমাদানিকৃত দ্রব্যগুলোকে প্রধানত: কি শ্রেণীবিভাগের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়
- এই শ্রেনী বিভাগের ভিত্তিতে ৭০,৮০ এবং ৯০ এর দশকে আমদানি বিন্যাস কোন ধরনের দ্রব্যের আপেক্ষিক গরুত্ব হ্রাস পেয়েছে;
- ৮০-র দশকে এবং ৯০-র দশকে উন্নয়নমূলক/অ-উন্নয়নমূলক আমদানি ব্যয়ের আপেক্ষিক গুরত্ব কি ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।
- সাম্প্রতিক আমদানি বিন্যাস।

সত্তর ও আশির দশকে আর্থিক মূল্যে আমদানি বিন্যাসের পরিবর্তনের চরিত্র

আমরা স্বাধীনতার পর ৭০ ও ৮০ -র দশকে যেসব দ্রব্যাদি আমদানি করেছিলাম তাকে প্রধানত ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। এই বিভাগগুলো হচ্ছে:

১. খাদ্য শস্য আমদানি: যেমন চাল ও গম
২. অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য আমদানি: যেমন ভোজ্যতেল, তৈলবীজ, চিনি, দুধ বা দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি।
৩. খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম
৪. যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং বিভিন্ন ধরনের স্থল-জল-আকাশ পরিবহন।
৫. অন্যান্য: এর মধ্যে কিছু দ্রব্য হচ্ছে কাঁচামাল বা মধ্যবর্তী পণ্য এবং কিছু দ্রব্য হচ্ছে চূড়ান্ত ভোগ্য পণ্য।

৫.৩ নং সারণীতে ভোগ্যপণ্যকে আলাদা করতে পারলে সঠিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষনের জন্য তা অনুকুল হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ ধরনের বিভাজিত তথ্য সকল বছরের জন্য অনুপস্থিত।

সারণী ৫.৩ ঃ আমদানি বিন্যাস : ১৯৭৩/৭৪-১৯৮৬/৮৭

বছর	মোট আমাদানি মি. টাকা (শতাংশ)	খাদ্র শস্য মি. টাকা (শতাংশ)	অন্যান্য খাদ্দ্রব্য মি. টাকা (শতাংশ)	খনিজ তেল মি. টাকা (শতাংশ)	যন্ত্রপাতি মি. টাকা (শতাংশ)	অন্যান্য মি. টাকা (শতাংশ)
১৯৭৩-৭৪	৭৩২০ (১০০)	৩২০৯.৩ (৪৪)	৩৮৮.৬ (৫)	৫৮৩.৭ (৮)	১০৩২ (১৪)	২১০৬.৪ (২৯)
১৯৭৪-৭৫	১০৮৪২.৪ (১০০)	৪৫০০.২ (৪২)	৬৩২.৯ (৬)	৯২৭.৭ (৯)	১১৯০.২ (১১)	৬৫৯২.৪ (৩২)
১৯৭৫-৭৬	১৪৭০৩.২ (১০০)	৩১১২.৮ (২৭)	৯.৪৪.০ (৬)	১৮৫৪.০ (১৩)	২০৮২.২ (১৪)	৫৯১০.২ (৪০)
১৯৭৬-৭৭	১৩৯৯২.৯ (১০০)	১৩৪৪.০ (১০)	১৪৯২.১ (১১)	৩৩৩৪.১ (২৪)	২৩৬৫.০ (১৭)	৫৪৫৭.৭ (৩৮)
১৯৭৭-৭৮	১৮২১৬.৩ (১০০)	৩৯১২.৯ (২১)	১৮১৮.২ (১০)	২৬৬৪.২ (১৫)	২৯১১.০ (১৬)	৬৯০৯.৬ (৩৮)
১৯৭৮-৭৯	২৩৩৪৩.৪ (১০০)	৩১৪০.৫ (১৩)	১৯৫১.৫ (৮)	২৬২৮.৬ (১১)	৪৯৯৬.৯ (২১)	১০৬২৫.৯ (৪৭)
১৯৭৯-৮০	৩৭৭২৯.০ (১০০)	৯৬৫০.০ (২৬)	২৮০৫.৮ (৭)	৬০৫০.০ (১৬)	৬৩৭২.৮ (১৭)	১২৮৫০.৪ (৩৪)
১৯৮০-৮১	৪২১৬০.০ (১০০)	৪১০০.০ (১০)	৩৩০২.০ (৮)	৯৪৬২.৩ (২২)	৯০৬৩.৩ (২১)	১৬২৩২.৪ (৩৯)
১৯৮১-৮২	৫২৩৬৪.০ (১০০)	৬৯১২.৯ (১৩)	৫১২০.৫ (১০)	১০৯৭০.০ (২১)	১০১৪৭.৫ (১৯)	১৯২১৩.১ (৩৭)
১৯৮২-৮৩	৫৪৮৮৯.০ (১০০)	৯১৫০.০ (১৭)	৬৫৯১.০ (১২)	১০৮৫৩.৭ (২০)	১০৬০৮.৯ (১৯)	১৭৬৮৫.৪ (৩২)

১৯৮৩-৮৪	৫৮৬৯৩.০ (১০০)	৯৯৩০.০ (১৭)	৭১৮০.৬ (১২)	৯৯৬৫.৭ (১৭)	১০৫১১.২ (১৮)	২১১০৫.৫ (৩৬)
১৯৮৪-৮৫	৫৮৬৯৩.০ (১০০)	১২৯৪০.০ (১৯)	৯৫৯৬.৪ (১৪)	১০৫৮৮.৬ (১৫)	১১৮৩৫.৩ (১৭)	২৪৪৮৬.৭ (৩৫)
১৯৮৫-৮৬	৭০৬৯০.০ (১০০)	৬৬৬৯.৩ (৯)	৯৮০৪.৯ (১৪)	১২১৬১.২ (১৭)	১২৬৫২.৩ (১৮)	২৯৪০২.৩ (৪২)
১৯৮৬-৮৭	৭৩৮০০.০ (১০০)	১০০৪০.০ (১৪)	৮৮৫০.০ (১২)	১০০৮২.৫ (১৪)	১৪৮২০.০ (২০)	৩০০০৭.৫ (৪০)
১৯৮২/৮৩ থেকে ১৯৮৬/৮৭ গড়	৬৫৪৯৮.৪ (১০০)	৯৭৪৫.৯ (১৪)	৮৩৯৯.২ (১২.৮)	১০৭০৩.৩ (১৬.৪)	১২০৮৫.৫ (১৮.৫)	২৪৫৩৭.৫ (৩৭.৫)
১৯৭৫/৭৬ থেকে ১৯৭৯/৮০ গড়	২১৫৯৭.০ (১০০)	৪৩৯২.০ (২০.৩)	১৮০২.৩ (৮.৩)	৩৩০৬.৩ (১৫.৩)	৩৭৪৫.৬ (১৭.৩)	৮৩৫০.৮ (৩৮.৭)

উৎস: ড. মাহাবুব হোসেন ও এ.আর খান. প্রাগুক্ত।

সরনীতে এই পাঁচ প্রকার পন্যের আপেক্ষিক অংশ কালানুক্রমিক ভাবে তুলে ধরা হল। প্রকৃত পরিমানগত বিন্যাস স্বাভাবতই আর্থিক বিন্যাসের অনুরূপ নাও হতে পারে। যেহেতু পণ্যের চলতি দামে মূল্য নিরূপিত হয়েছে।

সারণীতে সর্বশেষ দুই সারিতে আমরা (১৭৫/৭৬-১৯৭৯/৮০)- এই পাঁচ বছরের গড় আপেক্ষিক বিন্যাসের সঙ্গে (১৯৮২/৮৩-১৯৮৬/৮৭) এই পাঁচ বছরের গড় আপেক্ষিক বিন্যাসের একটি সুবিধাজনক তুলনা করার প্রয়াস পেয়েছি। এই তুলনামূলক গড় পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে;

ক. বস্তুত : উভয় কালপর্বেই আমদানি বিন্যাস খুব একটা পরিবর্তন হয় নাই। খাদ্য দ্রব্য আমাদানির আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭০ দশকের শেষার্ধে ছিল (১৪.৯+১২.৮) = ২৭.৭ শতাংশ। ১৯৮২-৮৭ কালপর্বে তা হচ্ছে ১৫.৩ শতাংশ। যন্ত্রপাতির আমদানির আপেক্ষিক গুরুত্ব আগে ছিল ১৮.৫ শতাংশ, পরে হয়েছে ১৭.৩ শতাংশ। অন্যান্য দ্রব্যাদির ভোগ্য পণ্য ও কাঁচামাল) গুরুত্ব আগে-পরে যথাক্রমে ছিল ৩৭.৫ শতাংশ এবং ৩৮.৭ শতাংশ।

> খাদ্য দ্রব্য আমদানির আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭০ দশকের শেষার্ধে ছিল (১৪.৯+১২.৮) = ২৭.৭ শতাংশ। ১৯৮২-৮৭ কালপর্বে তা হচ্ছে (২০.৩+৮.৩) = ২৮.৬ শতাংশ।

খ. তবে ১৯৭৩-৭৫ কালপর্বের সঙ্গে তুলনা করলে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ধরা পড়ে। এই কালপর্বে দেখা যায় যে আমদানি ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক (৪৮ থেকে ৪৯ শতাংশ) ব্যয়িত হয়েছিল খাদ্য দ্রব্য ক্রয়ের জন্য। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ ১৯৭৩-৭৪ সাল ছিল বাংলাদেশের জন্য দুর্ভিক্ষের বছর।

গ. কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ১৯৭৫ এর পর দ্রুত খাদ্য-শস্য ভিত্তিক আমদানি ব্যয় মোট ব্যয়ের ২৭ শতাংশ থেকে কমতে থাকে এবং ১৯৮৬ -৮৭ সালে তা ১৪ শতাংশে পরিনত হলেও অন্যদিকে একই সময়ে অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্যের জন্য আমদানি বাড়তে থাকে এবং তা ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ১৩ শতাংশ উপনীত হয়। ফলে দুই এ মিলে খাদ্য- দ্রব্য বাবদ আমদানি ব্যয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৯৭৫'এর পর আর খুব একটা বদল হয় নি। আর অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেও তেমন কোন পরিবর্তন যে হয় নি সেটাও তালিকার তথ্যে স্বত:প্রতীয়মান।

৯০ দশকে আমদানি বিন্যাসের পরিবর্তন

৯০ দশকে আমদানিকৃত দ্রব্যগুলোকে আমরা ৭০ ও ৮০-র দশকে আমদানিকৃত দ্রব্যের মতই পাঁচ ভাগে ভাগ করে দেখার চেষ্টা করবো। তবে সময় বদলে যাওয়ার কারণে আমাদের বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত পণ্যগুলোর সামান্য হের-ফের হবে। যেমন ৯০ দশকে-

১. খাদ্য শস্যের অন্তর্ভুক্ত আমদানি হচ্ছে চাল, গম এবং অন্যান্য শাক-সবজি (Vegetable Product)

২. অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হবে তেল, তৈলবীজ, দুগ্ধজাত খাবার, তামাক, মদ ও অন্যান্য পানীয়।

৩. খনিজ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হবে খনিজ তেল, কেরোসি, সাদা সিমেন্ট, ইত্যাদি সকল প্রকার খনিজ পদার্থ (Mineral Provuct)।

৪. যন্ত্রপাতির অন্তর্ভুক্ত পণ্য অবশ্য খুব একটা বদলায়নি। আগের মতই এর অন্তর্ভুক্ত পণ্যগুলো হচ্ছে সকল যন্ত্র, যন্ত্রাংশ ও যানবাহন।

৫. বাদ বাকি অন্যান্য পণ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নানা ধরনের কাঁচামাল ও ভোগ্য পণ্য যেমন: সার, রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়া, কাগজ তৈরীর মন্ড, সুতা, জুতা, ধাতু ইত্যাদি।

সমগ্র ৯০ দশকে খাদ্যদ্রব্যের আমদানির আপেক্ষিক অংশ সর্ব্বোচ্চ ১৯ শতাংশ (১৯৯১-৯২) থেকে ক্রমাগত কমে ১৯৯৬-৯৭ সালে সর্বনিম্ন মাত্র এ শতাংশে উপনীত হয়।

উপরোক্ত বিভাজনের ভিত্তিতে ৫.৪ নং সারণীতে ৯০ দশকে আমদানি বিন্যাস কালানুক্রমিক পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরা হোল। এই সারণীতে ৯০ দশকে ৮০ দশকে তুলনায় আমদানি বিন্যাস যে সব লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন দেখা যায় তা নিম্নরূপ:

ক. খাদ্য দ্রব্যের আমদানির আপেক্ষিক অংশ ১৯৮২-৮৭ কালপর্বে গড়ে ছিল প্রায় ২৮ শতাংশ। ৭০ দশকের শেষার্ধেও অংকটি (Figure) ছিল একই রকম। কিন্তু সমগ্র ৯০ দশকে এই অংকটি সর্ব্বোচ্চ ১৯ শতাংশ (১৯৯১-৯২) থেকে ক্রমাগত কমে ১৯৯৬-৯৭ সালে সর্বনিম্ন মাত্র ৭ শতাংশে উপনীত হয়। বস্তুত : এই সময় খাদ্যশস্যের আমদানি গুরুত্ব ১০ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ৩ শতাংশে। পক্ষান্তরে অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের আপেক্ষিক গরুত্বও সমান্তরালভাবে ৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪ শতাংশ।

সারণী ৫.৪ ঃ আমদানি বিন্যাসের পরিবর্তন (১৯৯০-৯১-১৯৯৭/৯৮)

বছর	মোট আমদানি	খাদ্যশস্য (শতাংশ)	অন্যান্য খাদ্য (শতাংশ)	খনিজ পদার্থ (শতাংশ)	যন্ত্রপাতি (শতাংশ)	অন্যান্য (শতাংশ)
১৯৯০-৯১	১০০	১০	৮	১৬	২২	৪৪
১৯৯১-৯২	১০০	১০	৯	১৬	২০	৪৫
১৯৯২-৯৩	১০০	৮	৮	১৫	১৯	৫০
১৯৯৩-৯৪	১০০	৮	৭	১৫	১৭	৫৩
১৯৯৪-৯৫	১০০	৮	৫	৭	২৯	৫১
১৯৯৫-৯৬	১০০	৯	৪	৭	২৯	৫১
১৯৯৬-৯৭	১০০	৩	৪	৭	২৭	৫৯
১৯৯৭-৯৮	১০০	৫	৪	৬	২৮	৫৭

উৎস: ১৯৯০-৯৪ পর্যন্ত তথ্য বি.বি.এস (১৯৯৭), ১৯৯৪-৯৮ পর্যন্ত তথ্য আই, এম, এফ (২০০০)

নোট: "সংশোধিত পরিমাপের" ভিত্তিতে প্রণীত।

খ. ৯০ দশকে পাশাপাশি আর একটি দ্রব্যের আমদানি গুরুত্বও যথেষ্ট পরিমানে হ্রাস পেয়েছে। সেটি খনিজ দ্রব্যাদি (Mineral Product)| মোট আমদানিতে খনিজ দ্রব্যাদির শতাংশ সমগ্র ৭০-৮০ দশকে গড়ে ছিল ১৬ শতাংশ। কিন্তু ৯০ দশকে তা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ১৯৯৭-৯৮ সালে হয় মাত্র ৬ শতাংশ।

গ. যে দুই ধরনের আমদানির আপেক্ষিক গুরুত্ব ৯০ দশকে বৃদ্ধি পেয়েছে তারা হচ্ছে "যন্ত্রপাতি" ও অন্যান্য দ্রব্যাদি (প্রধানত: ভোগ্য পণ্য ও নানা ধরণের কাঁচামাল)। যন্ত্রপাতির আপেক্ষিক গুরুত্ব পূর্ববর্তী দশকগুলোতে ছিল ১৭ থেকে ১৮ শতাংশের মধ্যে। ৯০ দশকে তা ক্রমশ ঃ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭-৯৮ সালে ২৮ শতাংশে পরিনত হয়। অনুরূপ ভাবে "অন্যান্য দ্রব্যের" আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র ৩৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭-৯৮ সালে ৫৭ শতাংশে পরিণত হয়। এই "অন্যান্য আমদানির" মধ্যে যে সব কাঁচামাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তার কতটুকু পুঁজিদ্রব্য বা যন্ত্রপাতি (Capital Goods) তৈরির জন্য কাঁচামাল এবং কতটুকু ভোগ্যপণ্য তৈরীর জন্য কাঁচামাল তা জানা থাকলে আমরা "আমদানি বিন্যাসে" ভোগ্যপণ্য কতটুকু এবং যন্ত্রপাতি কতটুকু সে বিষয়ে সম্যক ধারনা অর্জন করতে সক্ষম হবো। আমদানি বিন্যাসের পরিবর্তনের প্রকৃত চরিত্র বোঝার ক্ষেত্রে তা অধিকতর সহায়কও বটে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে সে আলোচনা তুলে ধরা হলো।

যন্ত্রপাতির আপেক্ষিক গুরুত্ব পূর্ববর্তী দশকগুলোতে ছিল ১৭ থেকে ১৮ শতাংশের মধ্যে। ৯০ দশকে তা ক্রমশ: বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭-৯৮ সালে ২৮ শতাংশে পরিণত হয়।

আমদানি বিন্যাসে পরিবর্তন ঃ অ-উন্নয়নমূলক ব্যয় বনাম উন্নয়নমূলক ব্যয়

আমদানি ব্যয়ে প্রধানত: দুরকমের চরিত্রের ব্যয় থাকে। একটিকে আমরা বলতে পারি অ-উন্নয়নমূলক ব্যয় অর্থাৎ যে ব্যযের দ্বারা আমরা তৈরী ভোগ্য পণ্য (finished Consumer Goods) এবং ভোগ্য পণ্য তৈরীর কাঁচামাল ক্রয় করে থাকি। অপর ব্যয়টি হচ্ছে উন্নয়নমূলক ব্যয় অর্থাৎ যে ব্যয়ের দ্বারা যন্ত্রপাতি বা পুঁজি দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি বা পুঁজিদ্রব্য তৈরির কাঁচামাল ক্রয় করা হয়। স্বভাবতই অর্থনীতিবিদগণ দেখতে আগ্রহী মোট আমদানি ব্যয়ে কোন্ ধরনের ব্যয় ক্রমাগত প্রাধান্য বিস্তার করেছে?

৫.৫ নং সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮৪/৮৫ থেকে ১৯৮৮/৮৯ পর্যন্ত মোট আমাদানিতে অ-উন্নয়নমূলক ব্যয়ের গুরুত্ব ছিল ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ। আরো লক্ষনীয় যে এই ব্যয় এই সময়ে ধীরে হরেও ছিল উর্ধ্বগামী। পক্ষাক্ষরে ১৯৯০-৯৪ কাল পর্বে দেখা যাচ্ছে অ-উন্নয়নমূলক ব্যয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৬৮ থেকে ৬২ শতাংশের মধ্যে ওঠা নামা করেছে। লক্ষনীয় যে এ সময়ে এই ব্যয় এর সাধারণ প্রবণতা ছিল নিম্নগামী। সুতরাং একই ভাবে উল্টো দিক থেকে বলা যে মোট আমদানিতে উন্নয়নমূলক ব্যয়ের প্রবনতা ৮০-র দশকের শেষোর্ধ নিম্নগামী হলেও ৯০ দশকের প্রথমর্ধে তা ছিল উর্ধ্বগামী।

সারণী ৫.৫ ঃ আমদানি বিন্যাসে পরিবর্তন : অ-উন্নয়নমূলক আমদানি বনাম উন্নয়নমূলক আমদানি

আমদানির ধরন	১৯৮৪/৮৫	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৬/৮৭	১৯৮৭/৮৮	১৯৮৮/৮৯	১৯৮৯/৯০	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৭/৯৮
ভোগ্যপণ্য (%)	৩২.৫	৩২.৮	৩২.৩	৩৭.২	৩৯.৯	৩৫	৩৯	৩৮	৩৩	৩৭.৭০
ভোগ্যপণ্যের কাচামাল	৩৮.৪	৩৬.১	৩২.৮	৩৫.০	৩৬.১	৩০	৩০	৩০	২৯	২৮.৪০
মোট অ-উন্নয়নমূলক আমদানি	৭০.৯	৬৮.৯	৬৫.১	৭২.২	৭৫.৫	৬৫	৬৯	৬৮	৬২	৬৬.১০
পুঁজিদ্রব্য	১২.৫	১২.৩	১৩.৪	১০.৬	১০.৩	১৪	১৩	১৩	২০	১৩.৭৩
পুঁজি দ্রব্যের জন্য কাঁচামাল	১৬.৬	১৮.৮	২১.৫	১৭.২	১৪.২	২১	১৮	১৯	১৮	২০.১৪
মোট উন্নয়নমূলক আমদানি	২৯.১	৩১.১	৩৪.৯	২৭.৮	২৪.৫	৩৫	৩১	৩২	৩৮	৩৩.৮৭
মোট আমদানি	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস: মোস্তাফিজুর রহমান (১৯৯৭) এবং বি.বি.এস. (১৯৯৭)

সাম্প্রতিক আমদানি বিন্যাস

ক. একবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রধান প্রাথমিক পণ্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১২.৩৫ শতাংশ। প্রধান প্রাথমিক পণ্যের মধ্যে ভাত, গম, খাদ্যদ্রব্য অন্তর্ভূক্ত। খনিজ দ্রব্য (তেলবীজ, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম) আমদানির পরিমান পূর্বের থেকে আরও হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ০.৯৭ ও .৬২ হয়।

খ. মূলধন যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য পণ্যে (EPZ-সহ) এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়ে।

সারণী ৫.৬ ঃ সাম্প্রতিক কালের আমদানি বিন্যাস

পন্য	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
১। প্রধান প্রাথমিক পন্য	৫৩৪৯ (১৩.১৩)	৪৪৭৭	৪২২৭ (৯.৮০)	৪৭২৫	৭২৭০ (১২.৩৫)
ভাত	৩৪৮(০.৮৫)	৫০৮	১১৩(০.২৬)	৮৯	১৬০৫(২.৭৩)
গম	১১২৬(২.৭৬)	৯৮৩	৯৪৯(২.২০)	১১৯৭	১৪৯৪(২.৫৪)
তেলবীজ	৫২৪(১.২৮)	৩৭৪	৫৩৪(১.২০)	৪৩২	৫৭১(০.৯৭)
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৯২৯(২.২৮)	৩১৬	৩৮৬(০.৮৯)	৪৭৮	৩৬৫(০.৬২)
তুলা	২৪২২(৫.৯৪)	২২৯৬	২২৪৫(৫.২০)	২৫২৯	৩২৩৫(৫.৪৯)
২। প্রধান শিল্পজাত পণ্য	৯৪৭৫(২৩.২৬)	৭৯০৬	৮৪০৩(১৯.৪৮)	৮৮৯৪	১০৮১৮(১৮.৩৮)
ভোজ্য তেল	১৭৬৬(৪.৩৩)	৯২৪	১৪৫০(৩.৩৬)	১৬২৬	১৮৬৩(৩.১৬)

পেট্রোলিয়াম পন্য	৪০৭০(১০.০০)	২০৭৬	২২৭৫(৫.২৭)	২৮৯৮	৩৬৫২(৬.২০)
সার	১০২৬(২.৫১)	১৩৩৯	১১১৭(২.৫৯)	৭৩৭	১০০৬(১.৭১)
ক্লিংকার	৬১৫(১.৫০)	৬৩৮	৫৭৪(১.৩৩)	৬৪৪	৭৬৬(১৩০)
প্রধান আঁশ	৪৯২(১.২০)	১০৭৮	১০১৮(২.৩৬)	১০১৭	১১৮০(২.০)
তন্তু	১৫০৬(৩.৬৯)	১৮৫১	১৯৬৯(৪.৫৬)	১৯৭২	২৩৫১(৪.০)
৩। মূলধন যন্ত্র	২২৮৮(৫.৬১)	৩৩২১	৩৫৫৬(৮.২৪)	৩৮১৭	৫৪৬২(৯.৩)
৪। অন্যান্য পন্যসহ	২৩৬২০(৫৭.৯৮)	২৫০০০	২৬৯৩৬(৬২.৪৬)	২৯৫৬৯	৩৫৩১৫(৫৯.৯৯)
মোট (মিলিয়ন ডলার)	৪০৭৩২২(১০০)	৪০৭০৪(১০০)	৪৩১২২(১০০)	৪৭০০৫(১০০)	৫৮৮৬৫(১০০)
% পরিবর্তন (একই বছর ধরে	১৯.৩৪	-০.০৭	৫.৯০	৯.০০	২৫.২৩

উৎস্য ঃ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের আমাদানিকৃত দ্রব্যসমূহকে প্রধানত: ৫ ভাগ করে দেখা যেতে পারে। এই ভাগগুলো হচ্ছে যথাক্রমে খাদ্য শস্য, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, খনিজ তেল, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি (মূলত: ভোগ্যপণ্য ও নানা ধরণের কাচামাল)। ৭০ ও ৮০-র দশকে দেখা যায় যে মোট আমদানিতে এসব বিভিন্ন ধরনের পণ্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব মোটামুটি অপিরিবর্তিত ছিল। এই সময়ে গড়ে মোট আমদানির প্রায় ২৮ শতাংশ ছিল নানাধরনের খাদ্য দ্রব্য, প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ ছিল খনিজ তেল ও যন্ত্রপাতি এবং বাকিটা ছিল অন্যান্য দ্রব্যাদি। ৯০ দশকে এই বিন্যাসের চেহারা কিছুটা পাল্টে যায়। তখন সাধারণভাবে খাদ্য-দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব নেমে আসে ১৮ থেকে ৯ শতাংশে। খনিজ পদার্থ ও যন্ত্রাংশের মধ্যে পুঁজি দ্রব্যের অনুপাত খনিজ দ্রব্যের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে অন্যান্য দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব পূর্বের ৩৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৫৮ শতাংশ। অর্থনীতিবিদরা আমদানি বিন্যাস কে অণ্য ধরনের শ্রেনী-বিভাজনের ভিত্তিতে মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। সেই অনুযায়ী দেখা যায় যে ৮০-র দশকে মোট আমাদানি ব্যয় অ-উন্নয়নমূলক ব্যয়ের গুরুত্ব ছিল উর্ধ্বগামী। পক্ষান্তরে ৯০-র দশকে এই ধরণের ব্যয়ের গুরুত্ব ছিল সাধারণভাবে নিম্নগামী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১। বাংলাদেশের মোট আমাদানিকৃত দ্রব্যগুলোকে বিভক্ত করা যায়-
ক. তিন ভাগে; খ. চার ভাগে; গ. পাঁচ ভাগে।

২. বাংলাদেশের আমদানি ব্যয়কে অর্থনীতিবিদরা ভাগ করেছেন
ক. তিন ভাগে; খ. দুই ভাগে; গ. চার ভাগে।

৩। ৭০-র দশকের তুলনায় ৮০-র দশকে আমদানি বিন্যাস সামগ্রিক বিচারে-
ক. কোন লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা যায় না;
খ. লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন দেখা যায় না;
গ. ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়।

৪। ৮০-র দশকের তুলনায় ৯০-র দশকে আমদানি বিণ্যাসে-
ক. লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা যায়; খ. লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন দেখা যায় না;
গ. ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়।।

৫। ৮০-র দশকে আমদানি ব্যয় অ-উন্নয়নমূলক ব্যয় ছিল তুলনামূলক ভাবে
ক. উর্ধ্বগামী; খ. নিম্নগামী; গ. স্থির।

৬। ৯০ এর দশকে আমদানি ব্যয় উন্নয়নমূলক ব্যয় তুলনামূলক ভাবে-
ক. উর্ধ্বগামী; খ. নিম্নগামী; গ. স্থির।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। আমদানী ব্যয়-এর বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী বিভাজনগুলো বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ৭০, ৮০ এবং ৯০ দশকের "আমদানি বিন্যাসের" পরিবর্তনের গতি প্রবণতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো লিখুন।

পাঠ-৫.৩ ঃ রপ্তানি বিন্যাস পরিবর্তন: গতি প্রবণতা

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- স্বাধীনতার পর পর বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের প্রধান সমস্যাগুলো কি ছিল ?
- কি ভাবে পরবর্তি দু দশকে রপ্তানি বিন্যাস শুভ পরিবর্তনের সূচনা হয়?
- কি ভাবে ৯০ দশকে এই শুভ পরিবর্তনের গতি ত্বরান্বিত হয় এবং বাংলাদেশ একটি শিল্পভিত্তিক রপ্তানিকারীতে পরিণত হয়;
- এই শুভ পরিবর্তনের দুর্বলতার দিকগুলো কি এবং রপ্তানি বিন্যাসের সর্বশেষ পরিণতি কি দাঁড়িয়েছে?

৭০ ও ৮০ দশকে রপ্তানি বিন্যাসে পরিবর্তন

স্বাধীনতার পর পর বাংলাদেশ তার রপ্তানি অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে তীব্র সংকটে পতিত হয়। প্রথমত: প্রাক-স্বাধীনতা আমলে প্রধান রপ্তানি শিল্প "পাট" খাতে মালিকানা বিহীনতার সংকট, মুক্তিযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে বিপুল উৎপাদন হ্রাস, প্রাক্তন বাজার সমূহের সঙ্গে নতুন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার সমস্যা, ইত্যাদি সমস্যাগুলো ছিল। দ্বিতীয়ত: কোন কোন পণ্য (যেমন, দেশলাই ও কাগজ) প্রাক-স্বাধীনতা আমলে পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানি হতো, সেই রপ্তানি বাজার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

সারণী ৫.৬ নং থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরবর্তী দুই দশকে প্রধানত: চার ধরনের দ্রব্য রপ্তানি করেছে। সেগুলো হচ্ছে:

ক. পাট ও পাটজাত দ্রব্য: এটি বাংলাদেশের প্রধান চিরায়ত (Traditional) রপ্তানি দ্রব্য।

খ. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য চা, নিউজপ্রিন্ট ইত্যাদি অন্যান্য চিরায়ত রপ্তানি দ্রব্য।

গ. চিংড়ি মাছ ও তৈরি পোষাক: এগুলোকে অ-চিরায়ত (Non-Traditional) রপ্তানি দ্রব্য বলা হয়ে থাকে। অবশ্য ইউরিয়াকে কেউ কেউ অচিরায়ত রপ্তানি পণ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ঘ. অন্যান্য রপ্তানি দ্রব্য: নানা ধরনের এসব পণ্যের পরিমান ও গুরুত্ব খুবই সামান্য যদিও তা ক্রমবর্ধমান।

১৯৭২-৭৫ কালপর্বে সমগ্র রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৭ শতাংশ এসেছিল "পাট" খাত থেকে। এর সঙ্গে অন্যান্য চিরায়ত পণ্যের আয় যোগ করলে চিরায়ত রপ্তানি পণ্য থেকে আয় এসেছিল মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৯৯ শতাংশ।

সারণী ৫.৬ ঃ রপ্তানি বিন্যাসে পরিবর্তন : ১৯৭২-৮৬ মূল্য (মি. ডলার এবং শতাংশ)

পণ্যের ধরন	১৯৭২-৭৫	১৯৭৫-৮০	১৯৮০-৮৫	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬
পাট	১১৫(৩২.৩১)	১২৪.১(২৩.৮৯)	১১৯.৭(১৫.৮৭)	১৫০.৮(১৬.১৪)	১২৩(১৫.১২)
পাটজাতদ্রব্য	১৯৩.৭(৫৪.৪২)	২৫৩.৯(৪৮.৮৬)	৩৪৪.৫(৪৫.৭০)	৩৮৯.৮(৪১.৭২)	২৯১.১(৩৫.৭৮)
চামড়া ও চামড়াজাতদ্রব্য	১৮.৮(৫.২৮)	৫০.৮(৯.৭৮)	৬৬.৭(৮.৮৪)	৬৯.৮(৭.৪৭)	৬০.৩(৭.৪১)
চিংড়ি, মাছ ইত্যাদি	৫.৫(১.৫৪)	২৪.৬(৪.৭৩)	৬৭.৪(৮.৯৪)	৮৯.৩(৯.৫৬)	১১৩.২(১৩.৯২)
চা	১৫.৩(৪.৩০)	৩৪.৪(৬.৬৩)	৫১.০(৬.৭৭)	৬১.০(৬.৫৩)	৩২.৬(৪.০০)
তৈরী পোষাক	০(০)	০.২(.০৩)	৩৩.৮(৪.৪৮)	১১৬.২(১২.৪৪)	১৩০.৬(১৬.০৫)
নিউজপ্রিন্ট	২.৯(০.৮২)	৪.৫(০.৮৭)	৫.৪(০.৭১)	৮.৫(০.৯১)	৭৩(০.৯০)
ইউরিয়া	০(০)	০(০)	৬.৯(০.৯১)	৪.৮(০.৫১)	অপ্যাপ্য

ন্যাপথা, বিটুমিন ইত্যাদি	১.৩(.৩৮)	১২.৫(২.৪০)	৩৩.৬(৪.৪৬)	২০.৮(২.২২)	১০.৪(১.২৭)
অন্যান্য	৩.৪(.৯৬)	১৪.৭(২.৮৩)	২৫.১(৩.৩৩)	২৩.৪(২.৫১)	৪৫.১(৫.৫৪)
মোট	৩৫৬(১০০)	৫১৯.৭(১০০)	৭৫৩.৯(১০০)	৯৩৪.৪(১০০)	৮১৩.৪(১০০)

উৎস ; ড. মাহাবুব হোসেন ও এ.আর খান, প্রাগুক্ত, ১৯৮৯।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় ১৯৮৫-৮৬ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের অর্ধেক আসতো "পাট" খাত থেকে। বাকি আসতো অচিরায়ত রপ্তানি পণ্য ও অন্যান্য রপ্তানি পণ্য থেকে। আর বাকিটা চিরায়ত অন্য তিনটি রপ্তানি পণ্য চা, চামড়া ও কাগজ থেকে।

প্রথমেই লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে সমগ্র রপ্তানি বিন্যাসে পুরো দুই দশক ধরে চিরায়ত রপ্তানি পণ্যের একক প্রাধান্য বজায় ছিল। প্রথম দিকে এই প্রাধান্যের মাত্রা যত বেশি ছিল, পরবর্তীতে তত বেশি না থাকলেও "একক প্রাধান্য" (Absolute Dominance) সর্বদাই বজায় ছিল। ১৯৭২-৭৫ কাল পর্বে সমগ্র রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৭ শতাংশ এসেছিল "পাট" খাত থেকে। এর সঙ্গে অন্যান্য চিরায়ত পণ্যের আয় যোগ করলে চিরায়ত রপ্তানি পণ্য থেকে আয় এসেছিল মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৯৯ শতাংশ। অর্থাৎ শুরুর দিকে আমাদের রপ্তানি বিন্যাস ছিল প্রাক-স্বাধীনতা আমলের রপ্তানি বিন্যাসের অনুরূপ।

অবশ্য ১৯৮০-৮৫ কালপর্বে এই বিন্যাসে লক্ষনীয় পরিবর্তনের সূচনা হয়। আমরা ৫.৩.১ নং তালিকায় দেখতে পাচ্ছি ঐসময় গড়ে মোট রপ্তানি আয়ে অ-চিরায়ত পণ্য তিনটির হিস্যা মাত্র ১.৫৪ হিস্যা ১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৭১ শতাংশে পরিনত হয়েছে। তবে এই হ্রাসের মূল কারণ শতাংশ রপ্তানি আয় ১৯৮০-৮৫ কালপর্বে সেখানে এসেছে মাত্র ৬২ শতাংশ আয়।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় ১৯৮৫-৮৬ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের অর্ধেক আসতো "পাট" খাত থেকে। বাকি অর্ধেকের অর্ধেক (অর্থাৎ এক চতুর্থাংশে) আসতো অচিরায়ত রপ্তানি পণ্য ও অন্যান্য রপ্তানি পণ্য থেকে। আর বাকিটা চিরায়ত অন্য তিনটি রপ্তানি পণ্য, চা, চামড়া ও কাগজ থেকে।

৯০ দশকে রপ্তানি বিন্যাসে পরিবর্তন

১৯৮৬-১৯৯০ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি বিন্যাসে এক বৈপ্লাবিক পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র রপ্তানি মূল্যে চিরায়ত পণ্যের "একক প্রাধান্য" ভেঙ্গে যায় এবং অ-চিরায়ত পণ্যগুলোর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্টিত হয়।

৭০ ও ৮০ দশকে আমরা দেখেছি কিভাবে অচিরায়িত পণ্য রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে নিজেদের আপেক্ষিক গুরুত্ব শুন্য থেকে ২০ শতাংশে নিয়ে এসেছে। এই প্রবনতা ৯০ দশকে আরো ত্বরান্বিত হারে অগ্রসর হয়। ৫.৭ নং সারণীতে প্রদত্ত তথ্য থেকে লক্ষ্য করা যায় যে ১৯৯০-৯১ সালে "পাট" খাত এর আপেক্ষিক গুরুত্ব মোট রপ্তানি আয়ের ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। এর সঙ্গে অন্যান্য আপেক্ষিক গুরুত্ব দাঁড়ায় মাত্র ৩২ শতাংশ। অর্থাৎ ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ এই চার বছরে বাংলাদেশের রপ্তানি বিন্যাসে এক বৈপ্লাবিক পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র রপ্তানি মূল্যে চিরায়ত পণ্যের "একক প্রাধান্য" ভেঙ্গে যায় এবং অ-চিরায়ত পণ্যগুলোর (তৈরী পোষাক ও চিংড়ি, মাছ ইত্যাদি) প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় অচিরায়ত পণ্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব ছিল ৫৮ শতাংশ। আর চিরায়ত পণ্যের সামগ্রিক আপেক্ষিক গুরুত্ব ছিল মাত্র ৩২ শতাংশ।

আমরা যদি ৫.৭ নং সারনীর দিকে তাকাই তাহলে দেখবো ১৯৯৮-৯৯ সালে রপ্তানি মূল্যের মাত্র ৭ শতাংশ আসছে পাট খাত থেকে। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র একটি পণ্য তৈরী পোষাক থেকে আসছে ৭৬ শতাংশ। বাকি ১৭ শতাংশের মধ্যে অন্যান্য খাত থেকে আসছে ৮ শতাংশ এবং চিরায়ত অন্যান্য

রপ্তানি পণ্য থেকে আসছে ৯ শতাংশ। অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে চিরায়ত পণ্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্বশেষ হিসাবানুযায়ী দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ।

বছর	কাঁচাপাট	পাটজাত দ্রব্য	চা	চামড়া ও চামড়াজাত	চিংড়ি, মাছ ইত্যাদি	তৈরি পোষাক	অন্যান্য
১৯৯০-৯১	৩২৩১(৫)	১৯৯৫(১৭)	১৫৪৪(৩)	৪৪২২(৭)	৫১০০(৮)	২৯৯৪১(৫০)	৬০৩৯(১০)
১৯৯১-৯২	৩৪৭৪(৫)	১১২৪৬(১৫)	১২৯৬(১.৮)	৪৯৮২(৬.৭)	৫৪২০(৭.৩)	৩৯৭৭০(৫৪)	৮০১০(১১)
১৯৯২-৯৩	২৭৯৫(৩.২)	১১৪৭৪(১৩)	১৫৫৫(১.৮)	৫২৭৫(৫.৯)	৬৯৯৭(৭.৯)	৫১১৭(৫৭)	৯০০২(১০)
১৯৯৩-৯৪	১৮৯৬(২.১)	১১৮৮২(১৪)	১৬৭০(১.৯)	৬১১৫(৬.৯)	৯১০৫(১০.৩)	৫৩০৭০(৬০)	৪৫০৬(৫)
১৯৯৪-৯৫	৩১৭৬(২.৩)	১২৪৬২(৮.৯)	১৩২৭(.৯)	৮১২০(৫.৮)	১২৩০১(৮.৮)	৮৯৭২৬(৬৪)	১২৫০২(৯)
১৯৯৫-৯৬	৩৭১০(২.৩)	১৩২৮৪(৮.৪)	১৩৫৪(.৯)	৮৬৫৮(৫.৫)	১২৮৩০(৮.১)	১০৪১৭৬(৬৬)	১৪৭৭৩(৯)
১৯৯৬-৯৭	৪৯৫৩(২.৬)	১৩৩৭৮(৭.১)	১৬২৩(.৯)	৮৩২৭(৪.৪)	১৩৬৬৪(৭.২)	১২৮১৫৫(৬৮)	১৮৪৯৩(১০)
১৯৯৭-৯৮	৪৮৯৪(২.১)	১২৬৪৮(৫.৪)	২১৫৭(.৯)	৮৬৪০(৩.৭)	১৩৩৩৮(৫.৭)	১৭১৭৭৫(৭৩)	২০৮৬৫(৯)
১৯৯৮-৯৯	৩৪৩২(১.৪)	১৪৪৩১(৫.৭)	১৮৪৫(.৭)	৮০৪০(৩.২)	১৩১১২(৫.২)	১৯২১৬১(৭৬)	২০৯৩৬(৮)

নোট : ১. ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত তথ্যের উৎস বি.বি.এস (১৯৯৭)
২. ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত তথ্যের উৎস আই.এম.এফ (২০০০)
৩. ১৯৯৩-৯৪ সালের পরিমাপটি সংশোধিত পরিমাপ এবং ১৯৯৮-৯৯ সালের পরিমাপটি আই.এম,এফের নিজস্ব পরিমাপ।

বাংলাদেশের রপ্তানি কাঠামোতে ৯০ দশকে যে পরিবর্তন এসেছে অর্থনৈতিক বিচারে তার শুভ দিক হচ্ছেঃ কাঁচামাল ও কৃষি ভিত্তিক রপ্তানির বদলে শিল্পজাত রপ্তানির গরুত্ব বৃদ্ধি। কিন্তু এর দুর্বল দিক হচ্ছে বহুমুখীনতার অভাব। সমগ্র রপ্তানিই বর্তমানে মাত্র একটি পণ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং তা হচ্ছে তৈরী পোষাক। তদুপরি এ কথাও সত্য যে তৈরী পোশাকের রপ্তানিলব্ধ আয়ের সিংহভাগ (প্রায় ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ) পুনরায় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতেই চলে যায়। ফলে নিট রপ্তানি মূল্য অর্ধেকের কমে নেমে আসে।

সাম্প্রতিক কালে রপ্তানি বিন্যাস

সাম্প্রতিক কালে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের রপ্তানি বিন্যাস পর্যালোচনা করে আমরা পাই বিগত অর্থবছর ২০১৬-১৭-এর তুলনায় কৃষিপন্য ও সিরামিক পন্য থেকে রপ্তানি আয় যথাক্রমে ৩৮.৫৫ শতাংশ ও ৩২.৭০ শতাংশ বেড়েছে তার পরে অবস্থান হস্তশিল্পের, তুলা ও তুলা পন্য, নিটঅপার, হোম টেক্সটাইল, পাট, রাসায়নিক পন্য, বোনা পোশাক, বিশেষায়িত টেক্সটাইল এবং পাদুকা। অন্যদিকে রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে মূলত পেট্রোলিয়াম উপজাত, প্রকৌশল পন্য, চা, প্লাস্টিক পন্য, চামড়া ও চামড়াজাত পন্য, কাঁচা পাট এবং হিমায়িত খাবার।

সারণী ৫.৮ : রপ্তানি আয়ের বিন্যাস ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির হার

খাত ভিত্তিক পন্য	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
১ ।প্রাথমিক পন্য	১৩০৫	১২৪৭	১৩৩৮	৩.৬০	৩.৬৫	-৪.৪১	৭.২৮
হিমায়িত খাদ্য	৫৩৬	৫২৬	৫০৮	১.৫২	১.৩৯	-১.৭৪	-৩.৪২
চা	২	৪	৩	০.০১	০.০১	১৪৪.২৬	-৩৮.০৩
কৃষিজাত পন্য	৩০৯	২৭৫	৩৮১	০.৭৯	১.০৪	-১১.১২	৩৮.৫৫
কাঁচা পাট	১৭৩	১৬৮	১৫৬	০.৪৮	০.৪২	-৩.০৮	-৭.২৪

অন্যান্য	২৮৫	২৭৪	২৯০	০.৭৯	০.৭৯	-৩.৯১	৫.৯৩
শিল্পজাত পন্য	৩২৯৭৪	৩৩৫৭৬	৩৫৪৮৬	৯৬.৮৮	৯৬.৭৮	১.৮৩	৫.৬৯
বোনা পোশাক	১৪৭৩৯	১৪৩৯৩	১৫৪২৬	৪১.৫৩	৪২.০৭	-২.৩৫	৭.১৮
নিটওয়ার	১৩৩৩৫৫	১৩৭৫৭	১৫১৮৯	৩৯.৭০	৪১.৪২	৩.০১	১০.৪০
বিশেষায়িত টেক্সটাইল	১০৯	১০৬	১১০	০.৩১	০.৩০	-২.৩৭	৩.৬৭
হোম টেক্সটাইল	৭৫৩	৭৯৯	৮৭৯	২.৩১	২.৪০	৬.১৩	৯.৯৫
তুলা ও তুল্য পণ্য	১০৩	১০৯	১২৫	০.৩২	০.৩৪	৬.৫৫	১৪.০৩
চামড়াও চামড়াজাত পন্য	১১৬১	১২৩৪	১০৮৬	৩.৫৬	২.৯৬	৬.২৯	-১২.০৩
পাট	৭৪৬	৭৯৫	৮৭০	২.২৯	২.৩৭	৬.৪৫	৯.৪৮
রাসায়নিক পন্য	১২৪	১৪০	১৫১	০.৪০	০.৪১	১৩.২১	৭.৬৬
পাদুকা	২১৯	২৪১	২৪৪	০.৭০	০.৬৭	৯.৯০	১.৩৩
প্রকৌশলী পন্য	৫১০	৬৮৯	৩৫৬	১.৯৯	০.৯৭	৩৫.০৫	-৪৮.৩২
পেট্রোলিয়াম উপজাত	২৯৭	২৪৪	৩৪	০.৭০	০.০৯	-১৭.৯৩	-৮৬.১৯
প্লাস্টিক পন্য	৮৯	১১৭	৯৮	০.৩৪	০.২৭	৩১.৪০	-১৫.৭৯
সিরামিক পন্য	৩৮	৩৯	৫২	০.১১	০.১৪	৩.৮৫	৩২.৭০
হস্তশিল্প	১০	১৪	১৭	০.০৪	০.০৫	৪৪.৬৬	১৫.২৬
অন্যান্য	৭২১	৮৯৯	৮৫১	২.৫৯	২.৩২	২৪.৭১	-৫.৩৭
মোট	৩৪২৫৭	৩৪৬৫৬	৩৬৬৬৮	১০০.০০	১০০.০০	১.১৬	৫.৮১

৯০ দশকে তৈরি পোশাকে রপ্তানির একক প্রাধান্য অটুট ছিল। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও তৈরী পোশাকের গুরুত্ব আগের মতোই আছে।

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতার পর পরই বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়া গভীর সংকট নিমজ্জিত হয়। এই সংকটগুলো ছিল মালিকানাবিহীন রপ্তানি শিল্প, রপ্তানি শিল্পগুলোর উৎপাদন হ্রাস এবং অনেক তৈরী বাজার হাতছাড়া হয়ে যাওয়া। ৭০ ও ৮০ দশকে রপ্তানি প্রক্রিয়া এই সংকট কাটিয়ে উঠে। তবে চিরায়ত রপ্তানি পণ্যের পাশাপাশি অচিরায়ত রপ্তানি পণ্যের আবির্ভাব ও দ্রুত প্রবৃদ্ধির সূচনা হয় এই কালপর্বে। ৯০ দশকে অচিরায়ত পণ্য বিশেষত : তৈরী পোশাক রপ্তানির অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং সমগ্র রপ্তানি কাঠামোতে এর একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও চিরায়ত কৃষি ভিত্তিক রপ্তানির বদলে অচিরায়তশিল্পজাত রপ্তানির আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি অর্থনৈতিক বিচারে একটি শুভ পরিবর্তন কিন্তু তারপরেও এ রদুটি দুর্বলতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথমত: রপ্তানির একপেশে নির্ভরতা এবং বহুমুখিনতার অভাব। দ্বিতীয়ত: আমাদের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য যেহেতু বিপুল পরিমানে আমদানি নির্ভর সেহেতু নিট রপ্তানি আয় তুলনামূলকভাবে বেশ কম। অবশ্য তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তৈরী পোশাকের রপ্তানি লব্ধ নিট আয়ের অবদান মোট নিট রপ্তানি আয়ে একক ভাবে প্রাধান্যশীল হয়ে থাকছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রপ্তানি খাতে-

ক. সংকট দেখা দেয়; খ. উন্নতি দেখা দেয়;

গ. অবস্থা একই রকম দেখা যায়।

২. পশ্চিম পাকিস্তানের তৈরী বাজার হাতছাড়া হওয়ার কারণে যে দুটি পণ্য রপ্তানি বিশেষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল তারা হচ্ছে-

ক. পাট ও পাটজাত দ্রব্য; খ. চিংড়ি ও মাছ; গ. দেশলাই ও কাগজ।

৩। ৭০ ও ৮০ দশকের প্রথম ৭ বছর সমগ্র রপ্তানিতে একক প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল-

ক. পাট ও পাটজাত দ্রব্য; খ. চিংড়ি ও মাছ;

গ. তৈরি পোশাক ঘ. অন্যান্য দ্রব্য।

৪। ৯০ দশকে সমগ্র রপ্তানিতে একক প্রাধান্য বিস্তার করেছিল-

ক. পাট ও পাটজাত দ্রব্য ; খ. তৈরি পোশাক;

গ. চিংড়ি ও মাছ।

৫। সর্বশেষ হিসাবনুসারে ১৯৯৮-৯৯ সালে মোট রপ্তানি আয়ে তৈরী পোশাকের অবদান ছিল-

ক. ৫০ শতাংশের নিচে; খ. ৭৫ শতাংশের উপরে; গ. ৭৫ শতাংশের নিচে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। বাংলাদেশের চিরায়ত রপ্তানি পন্য ও অচিরায়ত রপ্তানি পন্যগুলো উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. "বাংলাদেশের রপ্তানি বিন্যাসে ৭০-৮০ দশকের তুলনায় ৯০ দশকে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে" ব্যাখ্যা করুন।

২। বর্তমান রপ্তানি বিন্যাসের সবলতা ও দুর্বলতাগুলো কি?

পাঠ-৫.৪ ঃ আমদানী রপ্তানি নীতি

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- প্রাক-স্বাধীনতা আমলে বাণিজ্য নীতি কি ছিল?
- স্বাধীনতা পরবর্তী কালপর্বে বাণিজ্যনীতি কিভাবে একটি নব্য ধনিক শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল?
- ৭৫ পরবর্তীতে কি ভাবে বাণিজ্যনীতির দিক-দর্শন পরিবর্তিত হয়?
- ১৯৮৫ সালের পর থেকে দাতা গোষ্ঠির সুপারিশকৃত বাণিজ্য নীতি কিভাবে "অবাধ আমদানি" ও "রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন" নীতিরূপে বিকাশ লাভ করে?
- ২০১৯-২০২০ সালের বাজেটে আমদানি নীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি কি?
- বাণিজ্যনীতির কতিপয় সীমাবদ্ধতা সম্ভাব্য বিকল্প নীতির কিছু ইংগিত।

আমদানি প্রতিস্থাপক বাণিজ্যনীতি ঃ পাকিস্তানী আমল

পাকিস্তানী আমলে সাধারনভাবে জোর দেয়া হয়েছিল "বিদেশী আমদানি" কমানোর উপর। অন্যভাবে বললে বলা যায় দেশীয় শিল্প দ্রব্য দ্বারা আমদানি পণ্যের প্রতিস্থাপনরে (Subsatitution) উপর। এজন্য নিম্নোক্ত অর্থনৈতিক কৌশলগুলো অনুসরণ করা হয়েছিল:

ক. স্থানীয় মুদ্রার অতিমূল্যায়ন (Over Valuation)

খ. আমদানি করার অধিকার লাইসেন্স মঞ্জুরী এবং নির্দিষ্ট কোটার উপর নির্ভরশীল করা।

গ. রপ্তানিকারকরা স্থানীয় মুদ্রার অতিমূল্যায়নের ফলে যেটুকু ক্ষতিগ্রস্থ হতো তা পুষিয়ে দেয়ার জন্য নানা আর্থিক প্রনোদনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেমন: রপ্তানি বোনাস স্কীম।

ঘ. উচ্চ হারের আমদানি শুল্ক আরোপ।

১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে তীব্র গতিতে আমদানি উদারীকরনের ফলে অনেক দেশী শিল্পই রুগ্ন হয়ে পরে।

স্থানীয় মুদ্রার অতিমূল্যায়ন হলে (কৃত্রিম ভাবে) আমদানিকৃত বিদেশী পণ্যের দাম টাকার হিসাবে কৃত্রিম ভাবে কমে যায়। ফলে আমদানি উৎসাহিত হয়। কিন্তু লাইসেন্স ও কোটা ও শুল্ক ব্যবস্থার ফলে অবাধ মুক্ত আমদানি অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিশেষত: উচ্চ আমদানি শুল্কের ফলে বিদেশী পণ্যের দাম বেড়ে যায় এবং দেশী পণ্য সংরক্ষিত বাজারে কম দামে সহজে বিক্রি হতে পারে।

পক্ষান্তরে স্থানীয় মুদ্রার অতিমূল্যায়নের ফলে রপ্তানিকারকদের স্থানীয় মুদ্রায় আয় কৃত্রিমভাবে কমে গিয়েছিল। যেহেতু এই রপ্তানিকারকরা শেষ বিচারে ছিলেন প্রধানত: পাট চাষীরা সেহেতু এই নীতিতে পাট চাষীরা খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হন। যদিও তদানিন্তন পাট কলের মালিকদের (যারা অধিকাংশই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের) ক্ষতি রপ্তানি বোনাস স্কীমের মাধ্যমে অনেকখানি পুষিয়ে দেয়া হয়েছিল। এই স্কীমের অধীনে তারা প্রতি ডলার রপ্তানির জন্য বাড়তি আর্থিক পুরষ্কার পেতেন।

উপরোক্ত নীতির পেছনে ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল দুটি:

ক. দেশী শিল্পের বিকাশ ও স্বনির্ভরতা।

খ. আমদানি কমিয়ে ক্রমশ: বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা।

কিন্তু উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো এই "সংরক্ষনবাদী বাণিজ্য নীতির" দ্বারা পুরোপুরি অর্জিত হয় নাই এবং উপরন্তু কতক বাড়তি অর্থনৈতিক কুফল তৈরী হয়েছিল।

প্রথমত: সংরক্ষন বাজারে যেসব বিদেশী পণ্য প্রতিস্থাপক দেশী শিল্প গড়ে উঠে তাদের চরিত্র

দেশোপযোগী ছিল না। অধিকাংশ আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্প ছিল ব্যয়বহুল, অদক্ষ, পুঁজিঘন এবং বিলাস পণ্য উৎপাদক। এসব শিল্পের শ্রমনিয়োগ মাত্রা ছিল তুলনামূলকভাবে কম এবং আয়ের সিংহভাগ চলে গিয়েছিল পুঁজিপতিদের পকেটে। একই ভাবে সংরক্ষিত বাজারে সর্বদাই আমদানি সরবরাহের তুলনায় ক্রেতাদের চাহিদা ছিল বেশি এবং ঘাটতি হয়েছিল। আমদানি প্রতিস্থাপক দেশী এবং আর্ন্তজাতিক বাজারে টিকতে সক্ষম নয়, তখন আমদানি সংরক্ষণের মাধ্যমে এই অদক্ষ শিল্পগুলো একবার তৈরী হয়ে যাওয়ার পর যখন দেখা গেল সেইগুলো আর্ন্তজাতিক মানের হয়নি শিল্পগুলো টিকিয়ে রাখার পক্ষে শক্তিশালী গোষ্ঠী স্বার্থও তৈরী হয়ে গেল। এভাবে আমদানি যে বানিজ্য ঘাটতি কমানোর আর একটি উপায় হচ্ছে রপ্তানি বৃদ্ধি। বস্তুত: পাকিস্তান আমলের বাণিজ্য নীতিতে "রপ্তানি বৃদ্ধির" প্রতি তেমন মনোযোগ দেয়া হয় নাই। সামগ্রিক বিচারে বাণিজ্য নীতির মধ্যে রপ্তানি-বিরোধী ঝোঁক (Anti Export Bias) অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। এর ফলে প্রধান রপ্তানি পণ্য উৎপাদক পাট চাষীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

বানিজ্যনীতি ঃ ১৯৭২-১৯৭৫

এ সময়ের পরিস্থিতিটা মনে রাখা প্রয়োজন। একটা দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে এবং তার জন্য তাকে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যে যেতে হয়েছে। ফলে দেশের শিল্প উৎপাদন বিধ্বস্ত। বাজারে শিল্প পণ্যের চাহিদা অনেক অথচ সরবরাহ খুবই সীমিত। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যেসব পণ্য সহজেই আমদানি হতো তাও পরিপূর্ণভাবে বন্ধ। বাইরে থেকে আমদানির জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন সেটিও সরকারের হাতে নেই। এই অবস্থাকে সংক্ষেপে "আমদানি পণ্যের সাধারন" দুষ্প্রাপ্যতা (Genarel Scarcity of Import) বলে অভিহিত করা যায়। সরকার তার সীমিত বৈদেশিক মুদ্রা "আমদানি লাইসেন্সের" বা আমাদানি পত্রটি" কয়েকবার টাকার বিনিময়ে হাত বদল হতে থাকে। এ ভাবেও আমদানি পণ্যের দাম বাজারে হু-হু করে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নব্য ধনীদের পকেটে অর্থ জমা হতে থাকে।

রাষ্ট্রায়তত্ত্ব খাত সরাসরি তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি না করে সরবরাহকারী/আমদানিকারী এজেন্ট নিয়োগ করার নীতি অনুসরণ করেন। ফলে তাদের উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিক ভাবে মুজিব আমলে তাই আমরা প্রচুর মুদ্রাস্ফীতি দেখতে পাই। এতে স্থির আয়ের লোকজন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পক্ষান্তরে নব্য-ধনী ব্যবসায়িরা ফুলে ফেঁপে উঠেন। সরকার এই অবস্থাকে মোকাবেলা করার জন্য সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকান ও পণ্যের দাম বেধে দেয়ার নীতি ঘোষনা করলেন। ফলে রাষ্টায়ত্ত্ব খাতগুলোর পণ্য ফ্যাক্টরী থেকে সরকার নির্ধারিত দামেই সরবরাহকারীদের কাছে বিক্রি হতো। কিন্তু এর সুফল ক্রেতারা ভোগ করতে পারেনি। বাড়তি চাহিদার মুখে বাজারে দাম ঠিকই বেড়ে যায় এবং ফ্যাক্টরী দাম ও বাজার দামের পার্থক্যটুকু মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের পকেটে চলে যায়।

সামগ্রিকভাবে আমদানি ব্যবসা এত লাভজনক হয়ে পড়ে যে শিল্পের চেয়ে ব্যবসার প্রতিই উদ্যোক্তোরা বেশি ঝুঁকে পড়েন। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের প্রভুত্ত্বের কারণে এই সময়ে এই ব্যবসায়িরা তাদের বিপুল মুনাফা শিল্পে লগ্নী বা বিনিয়োগ করেননি। ফলে পাকিস্তান আমলে যেমন সংরক্ষিত বাজারে কিছু দেশী শিল্প গড়ে উঠেছিল। ১৯৭২-৭৫ কালপর্বে সেটাও সেই স্বল্প সময়ে সম্ভব হয়নি। সাধারনভাবে বলা যায় সেই সময়টা ছিল "দ্রুত অর্থ সঞ্চয়ের" সময়। এমনকি "ওভার ইনভয়েসিং" এর মাধ্যমে অর্থাৎ কৃত্রিম ভাবে আমদানি পণ্যের দাম সরকারী কাগজে বেশি দেখিয়ে দুষ্প্রাপ্য

বৈদেশিক মুদ্রা তখন বিদেশী সরবরাহকারীর সঙ্গে যোগ সাজসের মাধ্যমে বিদেশী ব্যাংকেও পাচার হয়ে যাচ্ছিল।

৭৫ পরবর্তি বাণিজ্য নীতির দিক পরিবর্তন

৭৫ পরবর্তি যারা ক্ষমতায় আসেন তারা ধীরে ধীরে উদার আমদানি ও রপ্তানিমুখী নীতির দিকে অগ্যসর হতে থাকেন। দফায় দফায় স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে "বাজারে বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের" সঙ্গে সরকারী বিনিময় হারের" সমতা ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে তারা অতীতের "রপ্তানি বিরোধী" নীতির পরিবর্তন সাধন করেন। কিভাবে সরকারী বিনিময় হার ও তুলে ধরা হল। সারণীতে বিভিন্ন ধরনের রপ্তানি ও আমদানির ক্ষেত্রে যে কার্যকর বিনিময় হার গড়ে উঠেছিল (অর্থাৎ সেই বিনিময় হার যা সমস্ত রকম কর, শুল্ক, বোনাস, দামের হের-ফের হিসাবে বিনিময় হারের গতি প্রবণতাগুলো থেকে বাণিজ্য নীতিতে কার্যত বিভিন্ন ধরনের রপ্তানি ও আমদানির প্রতি উৎসাহ বা অনুৎসাহের আপেক্ষিক প্রবণতার চিত্রটিও এই সারণীতে পাওয়া যাবে। অবশ্য এই চিত্র ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে ১৯৮৪-৮৫ পর্যন্ত বিস্তৃত।

সারণী ৫.৮ ঃ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার এবং কার্যকর বিনিময় হার

বছর	সরকারী বিনিময় হার	চিরায়ত রপ্তানি	অচিরায়ত রপ্তানি	আমদানি	ওয়েজ আর্নার স্কীম
১৯৭৩-৭৪	৭.৯৭	৭.৯৪	৯.১৭	৯.৭২	---
১৯৭৪-৭৫	৮.৮৮	৭.৪৫	৭.৪৫	৮.৬৯	---
১৯৭৫-৭৬	১৫.০৫	১২.৭২	১২.৯০	১৫.২২	---
১৯৭৬-৭৭	১৫.৪৩	১৩.৬৮	১৪.০৭	১৮.২৩	---
১৯৭৭-৭৮	১৫.১২	১৩.২৯	১৩.৭৪	১৭.৭৯	---
১৯৭৮-৭৯	১৫.২২	১৩.১৯	১৩.৬৮	১৮.০৭	---
১৯৭৯-৮০	১৫.৪৯	১৩.২৫	১৪.৩৬	১৭.১১	১৯.২১
১৯৮০-৮১	১৬.২৬	১৩.১৭	১৪.০৮	১৭.৩৫	২০.১১
১৯৮১-৮২	২০.০৭	১৪.৬৯	১৫.৫৩	১৮.৫৫	২২.৭৯
১৯৮২-৮৩	২৩. ৮০	১৫.৬১	১৫.৮৫	১৯.৮৮	২৪.১২
১৯৮৩-৮৪	২৪.৯৪	১৪.৯০	১৫.৮২	১৯.১৩	২৭.১৬
১৯৮৪-৮৫	২৫.৯৬	১৫.৫৯	১৩.৭৩	১৬.৪২	২৯.২৯

উৎস: ড. মাহবুব হোসেন ও এ.আর.খান, প্রাগুক্ত পৃ. ৯৪

উপরোক্ত সারণীতে প্রদত্ত তথ্য থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো পৌছানো সম্ভব:

সাধারনভাবে সর্বদাই আমদানি ক্ষেত্রে কার্যকর বিনিময় হার উভয় প্রকার রপ্তানির কার্যকর বিনিময় হারের চেয়ে বেশি ছিল। এ থেকে নীতিমালার রপ্তানি বিরোধী ঝোঁক ফুটে উঠেছে।

ক. আমরা যদি ওয়েজ অর্নার-স্কীমের বিনিময় হারটিকে বাজার বিনিময় হারের প্রতিফলক ধরে নেই (যার পক্ষে যুক্তি আছে যেহেতু উপরোক্ত হারটি ওয়েজ আর্নারদের ডলার "আয় সার্টিফিকেট" এর বাজার মূল্য) তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই হারটি সবসময়ই সরকারী হারের চেয়ে বেশি ছিল। তবে সরকারী হারের সঙ্গে এই হারের ব্যবধান ১৯৭৯-৮০ সালে ছিল সর্বোচ্চ ২৪ শতাংশ। কিন্তু ১৯৮৫-৮৫ তে তা ১২ শতাংশে নেমে আসে। আমরা আরো দেখতে পাই যে ১৯৭৩-৭৪ সালে সরকারী বিনিময় হার ছিল ১ ডলার = ৮.৮৮ টাকা। কিন্তু ১৯৭৫-৭৬ এসে হার হয় ১ ডলার= ২৫.৯৬ টাকা। অর্থাৎ ১৯৭৪-৭৫ এর তুলনায় শতকরা প্রায় ভাগ অবমূল্যায়ন। সাধারনভাবে এই অবমূল্যায়নের ফলেই "সরকারী হার" ও "বাজার হারের" মধ্যে এই সময় ব্যবধান কমে আসে। অবশ্য এর পরেও বাজারের হার বেশিই থেকে গিয়েছিল।

খ. সাধারনভাবে সর্বদাই আমদানি ক্ষেত্রে কার্যকর বিনিময় হার উভয় প্রকার রপ্তানির কার্যকর বিনিময় হারের চেয়ে বেশি ছিল। এ থেকে নীতিমালার রপ্তানি বিরোধী ঝোঁক ফুটে উঠেছে।

গ. রপ্তানি ক্ষেত্রে ঘনিষ্ট পর্যবেক্ষনে দেখা যায় যে অচিরায়ত রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে কার্যকর বিনিময় হারের পরিমাণ চিরায়ত পণ্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে ১৯৮৪-৮৫ নাগাদ সরকারী অবমূল্যায়নের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সরকারী বিনিময় হার বাজারের হারের কাছাকাছি চলে আসে। তবে এর পরেও বিভিন্ন ধরনের কর বোনাস ইত্যাদির মাধ্যমে কিছুটা আমদানিমুখীনতা এবং রপ্তানি বিরোধী ঝোঁক বাণিজ্য নীতিতে টিকে ছিল। তবে রপ্তানি বিরোধী ঝোক ও আমদানি অনুকুল ঝোক উভয়ই ছিল ক্রমহ্রাসমান। তুলনামূলক ভাবে চিরায়ত রপ্তানি পণ্যের প্রতি আনুকুল্য ছিল অচিরায়ত রপ্তানি পণ্যের তুলনায় কম।

তুলনামূলক ভাবে চিরায়ত রপ্তানি পণ্যের প্রতি আনুকুল্য ছিল অচিরায়ত রপ্তানি পণ্যের তুলনায় কম।

১৯৮৫ পরবর্তী আমদানি উদারীকরণ নীতি

১৯৮৫ সালের পর থেকে বৈদেশিক দাতা গোষ্ঠী বাংলাদেশ সরকারকে কতকগুলো "সংস্কার" কর্মসূচি গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়। এই পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ:

ক. যে সব নির্বাচিত পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ ছিল, সেগুলোর অধিকাংশই আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকায় ফিরিয়ে আনা হয়।

খ. বিভিন্ন পণ্যের উপর যে বিভিন্ন হারের শুল্কহার (আমদানি কর) বিদ্যমান ছিল সেগুলোর বিভিন্নতা হ্রাস করে সীমিত সংখ্যক সুষম হার চালু করা হয়।

গ. গড় শুল্ক হার এবং অধিকাংশ পণ্যের শুল্ক হার হ্রাস করা হয়।

এসব ব্যবস্থার ফলে আমাদানি উৎসাহিত হয় এবং বিভিন্ন আমদানি পণ্যের মধ্যে যে তুলনামূলক বৈষম্যের (Discrimination) বিধায় চালু ছিল তা কমে যায়। পাশাপাশি এর ফলে দেশী কতিপয় শিল্প প্রবলতার বিদেশী প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হয় এবং যারা তুলনামূলক ভাবে অদক্ষ তারা বাজার থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। এ ধরনের কতিপয় শিল্প হচ্ছে যন্ত্রপাতি (পাম্প মেশিন), বস্ত্র শিল্প, হস্তচালিত তাঁত শিল্প ও ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। চোরা পথে আমদানি এবং গার্মেন্টস শিল্পের বেঁচে যাওয়া বস্ত্রের সরবরাহের কারণেও এই সময় বাজারে কোন কোন দেশী শিল্প "সংরক্ষণ" সুবিধার ব্যবস্থা থাকলেও কার্যত: তা ভোগ করতে ব্যর্থ হয়। বিশেষত: ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে তীব্র গতিতে আমদানি উদারীকরনের ফলে অনেক দেশী শিল্পই রুগ্ন হয়ে পড়ে। "আমদানি সংরক্ষনের" (Trade Restrictiveness) মাত্রার একটি আন্তর্জাতিক সূচক আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়। এই সূচকে সবচেয়ে রক্ষণশীলদের জন্য ১০ পয়েন্ট এবং সবচেয়ে কম রক্ষণশীল দেশদের জন্য ১ পয়েন্ট মান ধরা হয়ে থাকে। আই.এম.এফের এই সূচকানুযায়ী ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেমের সূচক মান ১০ এই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সূচক ৯০ দশকের প্রথমার্ধে তা অত্যান্ত দ্রুত নেমে আসে। ১৯৯৫-৯৬ সালে তার মান দাঁড়ায় ৭ (ভাগ)। কিন্তু এর পর থেকে "আমদানি উদারীকরনের" গতি পুনরায় হ্রাস পেতে শুরু করেছে। যদিও এতে দাতারা অসন্তুষ্ট, কিন্তু ১৯৯৭-৯৮ সালের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বাজেটে উল্লেখ করেছিলেন,"আমি দুঃখের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, বিগত সময়ে আমদানি শুল্ক হ্রাসের অপ্রয়োজনীয় উৎসাহের কারণে আমাদের অনেক দেশীয় শিল্প বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।"

অবশ্য আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রবনতাটি শ্লথ হয়ে পড়লেও ১৯৯৬-২০০১ কালপর্বে এর গতিমুখ পরিবর্তিত হয় নাই। বিগত সর্বশেষ ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেটে আমদানি শুল্কের হার সহজীকরণ এবং গড় হার কমিয়ে ফেলার প্রবনতা বাস্তবে অব্যাহতই ছিল। ১৯৯৮-৯৯ সালে সর্বোচ্চ শুল্ক হার ছিল ৪০ শতাংশ। ১৯৯৯-২০০০ সালে তা ৩৭.৫০ এ নামিয়ে আনা হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আজেট ৬টি শুল্ক হার (০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫) রাখা হয়। ৩ শতাংশ রেগুরেটরী শুল্ক নির্ধারণ করা হয় সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক বিশিষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে। আমদানি প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান ১২টি সম্পূরক শুল্ক (১০, ২০, ৩০, ৪৫, ৬০, ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০, ৩০০, ৩৫০ এবং ৫০০) অব্যহত থাকবে ২০১৯-২০ সাল পর্যন্ত। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মসুর, গম, পেঁয়াজ, ভোজ্যতেল, সার, বীজ, কাচা তুলা ও কাঁচামাল কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বিনা শুল্কে আমদানি করার সুবিধা দেয়া আছে। একই নিয়ম প্রযোজ্য জীবন রক্ষাকারী ড্রাগ ও ঔষুধের ক্ষেত্র। স্থানীয় কৃষকদের সুরক্ষার্থে বিদ্যমান সর্বোচ্চ ২৫% শুল্কের সাথে সম্প্রতি ২৫% রেগুলেটার শুল্ক ধার্য করা হয় ধান আমদানির উপর।

রপ্তানি প্রনোদনাসমূহ

মধ্যে ৮০ দশকের পর থেকে দাতাদের সুপারিশ অনুযায়ী আমদানি উদারীকরনের পাশাপাশি রপ্তানি বৃদ্ধির জন্যও সরকার নানাধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই সময় সরকার সমূহের পরিবর্তন সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রে অনুসৃত রপ্তানি অনুকূল নীতির কোন পরিবর্তন হয় নাই। রপ্তানি ক্ষেত্রে প্রদত্ত অসংখ্য নানাধরনের আর্থিক প্রনোদনাকে মোট ৩টি ধরনে ভাগ করা সম্ভব:

ক. মূল্য সংযোজন সহায়তা (প্রাথমিক উপাদানসমূহের জন্য প্রযোজ্য)
খ. ইনপুট সহায়তা (মধ্যবর্তী পণ্যের ক্ষেত্রে সহায়তা)
গ. উৎপাদিত দ্রব্যের উপর প্রদত্ত সুবিধা।

এসব আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য যে সব সরকারী সংস্থাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে শুল্ক রেয়াৎ ও শুল্ক প্রত্যাবর্তন অফিস (DEDO), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (EPB) ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

এসব আর্থিক সহায়তা ছাড়াও সরকারী উদ্যোগে তৈরী হয়েছে বিশেষ ধরনের "রপ্তানি প্রক্রিয়াজতকরণ এলাকা"। এখানে প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিমুখী দেশী-বিদেশী শিল্পসমূহ বিশেষ ধরনের অন্যান্য আরো অনেক সুবিধা ভোগ করে থাকেন। যেমন: ই.পি.জেড এলাকায় যত আমদানি দ্রব্য আসবে এবং এখান থেকে যত দ্রব্য রপ্তানি হবে আগামী ১০ বছর পর্যন্ত তাদের উপর কোন শুল্ক বা আয়-কর থাকবে না। এসব বিভিন্ন রকম রপ্তানি নীতির ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের ই.পি.জেড গুলোতে নিট বাণিজ্য উদ্বৃত্ত তৈরী হয়েছে এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ১১ শতাংশ তৈরী হয়েছিল এই ই.পি.জেল অঞ্চলগুলোতে।

বিভিন্ন রকম রপ্তানি নীতির ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের ই.পি.জেড গুলোতে নিট বাণিজ্য উদ্বৃত্ত তৈরী হয়েছে এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ১১ শতাংশ তৈরী হয়েছিল এই ই.পি.জেল অঞ্চলগুলোতে

বর্তমানে বাংলাদেশে ৮টি ইপিজেড রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ইপিজেড থেকে মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭,২০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা দেশের মোট জাতীয় রপ্তানির প্রায় ১৯.৬৫ শতাংশ।

রপ্তানি মুখী শিল্পায়ন ঃ মৌল দর্শনের সীমাবদ্ধতা

দাতারা যে সংস্কার কর্মসূচির সুপারিশ করেন তাতে কতকগুলো পূর্বানুমান রয়েছে। যেমন ধরে নেয়া হয় যে আমদানি উদারীকরনের ফলে সস্তায় কাঁচামাল আমদানি হবে এবং বিদেশী পুঁজিও আকৃষ্ট হবে। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের সস্তা শ্রম দিয়ে এই কাঁচামাল ও বিদেশী-দেশী পুঁজি ব্যবহার করে এমন অনেক শিল্প পণ্য তৈরী করতে সক্ষম হবে যা বাইরের বাজারে রপ্তানি যোগ্য। এর ফলে রপ্তানি লব্ধ আয় দ্বারা পুনরায় আমদানি করে পুনরায় রপ্তানি করা সম্ভব হবে। এভাবে চক্রানুক্রমিক ভাবে প্রবৃদ্ধি ও শিল্পায়ন সম্ভব হবে।

এই পূর্বানুমানগুলো যেসব কারণে বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে সেগুলো হচ্ছে:

ক. দ্রুত ও সহসা আমদানি বৃদ্ধি পেলে অনেক দেশী শিল্প দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে।
খ. আমদানি যে হারে বৃদ্ধি পায়, রপ্তানি সে হারে বৃদ্ধি নাও পেতে পারে। ফলে বাণিজ্য ঘাটতি না কমে বেড়ে যেতে পারে। শুধু চরমভাবে নয়, এমনকি আপেক্ষি হারেও বাণিজ্যিক ঘাটতি বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশেষত: যদি রপ্তানি পণ্যের আমদানি নির্ভরতা অত্যাধিক হয়।

গ. বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে "আর্থিক প্রনোদনা" রপ্তানি বৃদ্ধি জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে। এখানে অবকাঠামোর অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ইত্যাদি কারণে বিদেশী পুঁজি যেমন কম আকৃষ্ট হয়ে তেমনি রপ্তানিকারী দেশী উদ্যোক্তরাও সহজে শিল্প স্থাপনের ঝুঁকি নিতে রাজী হন না।

ঘ. এ ধরনের অর্থনীতি যথেষ্ট পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং আর্ন্তজার্তিক উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে এদের অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এতে দ্রুত অগ্রগতি যেমন সম্ভব তেমনি দ্রুত পতনও সম্ভব।

তাই শেষ বিচারে "অবাধ আমদানি" বা নিছক রপ্তানি বৃদ্ধিই আমাদের মত দেশের জন্য যথেষ্ট নয়। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের বাণিজ্য অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে নির্বাচিত পণ্যের জন্য স্বল্পকালীন সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশী শিল্পকে বিকশিত করে দেয়ার নীতি ভুল নয়। এটি ভুল হয় তখনই যখন তা "রপ্তানি বিরোধিতায়" পরিনত হয় অথবা চিরস্থায়ী সংরক্ষণের জন্ম দেয়। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে নিছক অবমূল্যায়নের মাধ্যমে রপ্তানি উৎসাহিত করার নীতি ফলপ্রসু নাও হতে পারে। আর্থিক প্রনোদনার মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা যথেষ্ট হয় না, যদি অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন অবকাঠামো, প্রযুক্তি, মানবসম্পদ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো অটুট থাকে।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তান আমলে স্থানীয় মুদ্রার হার কৃত্রিম অতিমূল্যায়ন "রপ্তানি বিরোধীতার" জন্ম দিয়েছিল। পাশপাশি লাইসেন্স প্রথা কোটা পদ্ধতি ও উচ্চ শুল্ক-প্রাচীর গড়ে তোলার মাধ্যমে "আমদানি বিরোধী" নীতি অনুসৃত হয়। এ সবের সম্মিলিত ফল ছিল অদক্ষ শিল্পায়ন, অসাম্য ও আঞ্চলিক বৈষম্য। স্বাধীনতার পর প্রথম তিন বছর সরকারী বিনিময় হার কৃত্রিমভাবে স্থানীয় মুদ্রার অতিমূল্যায়ন করে রেখেছিল। এ সময় আমদানি দুস্প্রাপ্যতার সুযোগ নিয়ে আমদানি ব্যবসায়ীরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে নব্য ধনীতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৫ এর পর বাণিজ্য নীতি ক্রমশ: রপ্তানি ও আমদানির অনুকুলে দিক পরিবর্তন করে। ১৯৮৫ সালের পর দাতাদের সুপারিশ অনুযায়ী শিল্পায়নের নীতি সরকারী ভাবে গৃহীত হয়। পরবর্তিতে সব সরকারই এই নীতি অনুসরন করে আসছেন। বিশেষত: ১৯৯০-৯৫ কালপর্বে অতি দ্রুত আমদানিকে অবাধ করা হয়েছিল। এর ফলে কতিপয় স্থানীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি এই সময় রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের জন্য প্রধানত: আর্থিক প্রনোদনা ও ই.পি.জেড অঞ্চলের বিশেষ সুবিধাও গড়ে তোলা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে একপেশে "অবাধ মুক্ত বাণিজ্যের" চেয়ে নির্বাচিত ক্ষেত্রে সাময়িক "সংরক্ষণ" অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর সুফলপ্রসূ হতে পারে। বস্তুত: কোন বিশেষ অর্থনৈতিক দর্শন অনুসরন না করে প্রয়োগবাদী বাণিজ্য কৌশলই উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আদর্শ কৌশল হিসাবে পরিগণিত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১। প্রাক-স্বাধীনতা আমলে স্থানীয় মুদ্রার সরকারী ডলার মান-

ক. বাজারের তুলনায় বেশি ছিল; খ. বাজারের তুলনায় কম ছিল;

গ. বাজারের তুলনায় সমান ছিল।

২. পাকিস্তানের আমলের আমদানি সংরক্ষণ নীতি-

ক. অদক্ষ শিল্পের জন্ম দিয়েছিল; খ. পুঁজি ঘন শিল্পের জন্ম দিয়েছিল;

গ. পাট চাষীদের বঞ্চিত করেছিল; ঘ. উপরের সবগুলোই সত্য ছিল।

৩। বাংলাদেশে স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২-৭৫ সময়কালে "আমদানি দুস্প্রাপ্যতার" সুযোগ নিয়ে দ্রুত-

ক. একদল আমদানি ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হয়;

খ. এক দল নব্য ধনীর সৃষ্টি হয় যারা ব্যবসা ও শিল্পে আগ্রহী ছিলেন না;

গ. আমদানি বৃদ্ধি পায়।

৪। ১৯৭৫-৮৫ কালপর্বে ক্রমশ: সরকারী বিনিময় হার ও বাজারের বিনিময় হারের ব্যবধান-

ক. বেড়ে যেতে থাকে ; খ. কমে যেতে থাকে;

গ. একই রকম থেকে যায়।

৫। ১৯৮৫ সালের পর সব সরকারই বাণিজ্য নীতির ক্ষেত্রে দাতাদের পরামর্শানুসারে -

ক. আমদানি অবাধ ও রপ্তানি উৎসাহিত করেছে;

খ. আমদানি অবাধ ও রপ্তানি সংকুচিত করেছে;

গ. রপ্তানি অবাধ ও আমদানি সংকুচিত করেছে।

৬। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য আদর্শ বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি হচ্ছে -

ক. অবাধ মুক্ত বাণিজ্য নীতি;

খ. নির্বাচিত ক্ষেত্রে সাময়িক সংরক্ষন সুবিধা প্রদান ও রপ্তানি অনুকুল নীতি;

গ. রপ্তানি মুখী শিল্পায়নের নীতি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। "অবাধ আমদানি" বাংলাদেশের শিল্প বিকাশে কি অবস্থা সৃষ্টি করেছে তা সংক্ষেপে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. "আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্পায়ন নীতির" ত্রুটি ও সুবিধাগুলো কখন এবং কিভাবে ঘটে থাকে তা অর্থনৈতিক সুক্তিসহ তুলে ধরুন।

২। আমাদের দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের পথে প্রধান অন্তরায়গুলো কি?

পাঠ-৫.৫ ঃ বৈদেশিক সাহায্য

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- একটি দেশের বৈদেশিক সাহায্যের কেন প্রয়োজন হয় এবং কেনই বা বাংলাদেশে ৮০-র দশকের তুলনায় ৯০-র দশকে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে কমে এসেছিল;
- বৈদেশিক সাহায্যে পরিমাণ কত এবং তার গুণগত কতিপয় বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে;
- এসব পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য শুভ না অশুভ;
- বৈদেশিক সাহায্যের সম্পর্কে এর সমালোচকদের সমালোচনাসমূহ এবং পাল্টা সমর্থনসূচক বক্তব্য।

বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের "বাণিজ্য ঘাটতি" একটি স্থায়ী সমস্যায় পরিনত হয়েছে। অর্থাৎ বরাবরই আমাদের রপ্তানি আয় দিয়ে আমদানি ব্যয় সংকুলান সম্ভব হয়নি। এই অবস্থা কিছুটা মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নীট উৎপাদন উপাদান আয় দ্বারা। প্রধানত এ ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রাপ্ত নীট উৎপাদন উপাদান আয় দ্বারা। প্রধানত এ ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্স। আমরা এই ইউনিটের ৫.১ নং পাঠে দেখিয়েছিলাম যে ৮০-র দশকে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল গড়ে জি.ডি.পি-র ১২ শতাংশের সমান। সেই ১২ শতাংশ ঘাটতির এক তৃতীয়াংশ তখন নীট উৎপাদন আয় দ্বারা পূরণ হয়ে যেত। ফলে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি যেটুকু অবশিষ্ট থাকতো তা হচ্ছে জি.ডি.পি-র ৮ শতাংশের সমান। বস্তুত: প্রতিবছর উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৮০ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া তখন আমাদের দেশ চলতে অক্ষম ছিল। আমরা সমষ্টিগত অর্থনীতির সূত্রানুযায়ী এও জানি যে "চলতি এ্যাকাউন্টের" এই ঘাটতির হু-ব-হু সমান হচ্ছে আমাদের "বিনিয়োগ-সঞ্চয়" ঘাটতি নিচের সমীকরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে:

৮০ -র দশকে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন মাত্রা ছিল জি.ডি.পি-র প্রায় ৮ শতাংশ। বৈদেশিক সাহায্য।

G.N.P + C+1
G.N.P = G.D.P + X-M
GDP + X-M = C+1
এখানে GDP - C -1 = M-X
অথবা S-1 = M-X
যেখানে:

G.N.P = মোট জাতীয় উৎপাদন।
G.D.P = মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন।
C = অভ্যন্তরীন ভোগ ব্যয়।
1 = জাতীয় বিনিয়োগ ব্যয়।
X = মোট রপ্তানি মূল্য।
M = মোট আমদানি মূল্য।

বস্তুত: বাণিজ্য ঘাটতি বা সঞ্চয় ঘাটতি পূরনের জন্যই বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়। ৮০-র দশকে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন মাত্রা ছিল জি.ডি.পি-র প্রায় ৮ শতাংশ। কিন্তু ৯০ দশকে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতির আপেক্ষিক হার অনেক কমে যায়। পড়ে তা জি.ডি.পি-র ৬-৭ শতাংশে পরিনত হয়। আর এই একই সময়ে রেমিট্যান্সের পরিমান দাঁড়ায় জি.ডি.পি-র ৩-৪ শতাংশ। সেই হিসাবে আমাদের বিদেশী সাহায্যের বাৎসরিক প্রয়োজনীয়তা প্রায় অর্ধেক হ্রাস পেয়ে জি.ডি.পি-র ২ থেকে ৪ শতাংশের মধ্যে নেমে এসেছে। সুতরাং সামগ্রিক ভাবে বলা যায় যে ৮০-র দশকের নয় যে আমরা আগের তুলনায় বেশি স্বনির্ভর হয়েছি। বরং ৯০ দশকে আমাদের অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে আরো অধিকতর সমন্বিত হয়েছে এবং বর্তমানে আমাদের অর্থনৈতিক নীতিমালাও দাতা গোষ্ঠীর সুপারিশ দ্বারা আগের চেয়েও বেশী বিপুল ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ

স্বাধীনতার পর থেকে ৩০ জুন ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট অবমুক্ত বিদেশী সাহায্যের পরিমান হচ্ছে ৩ হাজার ১শত ৯৬ কোটি ৯৩ লক্ষ ডলার। এই বৈদেশিক সাহায্যের ৪৯.৭ শতাংশ হচ্ছে অনুদান এবং ৫০.৩ শতাংশ হচ্ছে ঋণ। সাহায্যের বস্তুগত বিন্যাস হচ্ছে নিম্নরূপ:

১। ১৭.৪ শতাংশ খাদ্য সাহায্য।
২। ৩০.১ শতাংশ পণ্য সাহায্য।
৩। ৫২.৪৩ শতাংশ প্রকল্প সাহায্য।

কিন্তু উপরোক্ত গড় হিসাব থেকে বিগত ২৫ বছরের প্রবনতাটির সঠিক চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। গতিশীল প্রবনতার মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে:

১. ১৯৭১-৭৬ সালে গড়ে প্রায় ৭৪ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্য আসতো দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে। কিন্তু ১৯৯৬-৯৭ সালে এসে দেখা যাচ্ছে দ্বি-পাক্ষিক বৈদেশিক সাহায্যের পরিমান ৪৮.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। এর তাৎপর্য বাংলাদেশের জন্য শুভ নয়। কারণ দ্বিপাক্ষিক সাহায্যের ক্ষেত্রে দাতারা ঐক্যবদ্ধ থাকে না এবং তাদের সঙ্গে দর কষা-কষির বাড়তি সুযোগ থাকে।

১৯৭১-৭২ সালে বিদেশী সাহায্যে অনুদানের অংশ ছিল প্রায় ৯০.৫ শতাংশ। ১৯৯৬-৯৭ সালে এর পরিমান ছিল ৪৯.৭ শতাংশ।

২. ১৯৭১-৭২ সালে বিদেশী সাহায্যে অনুদানের অংশ ছিল প্রায় ৯০.৫ শতাংশ। ১৯৭৯-৮০ সালেও এই অনুদানের আপেক্ষিক হার ৫৩.২৫ শতাংশ ছিল অর্থাৎ মোট সাহায্যের সিংহভাগ ছিল অনুদান। বস্তুত: ১৯৮৪-৮৫ সালে এরশাদের সামরিক শাসনের আমলে অনুদানের হার ৫৫.৪ শতাংশে পরিনত হয়। এর পর অবশ্য তা পুণরায় ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৯৬-৯৭ সালে বিদেশী সহায্য মোট অনুদানের হার ছিল ৪৯.৭ শতাংশ।

৩. বিদেশী সাহয্যে প্রকল্প সাহয্যের অংশ ১৯৭১-৭২ সালে ছিল মাত্র ১.৩ শতাংশ। ১৯৯৬-৯৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭৫.৪ শতাংশ। এটিও বাংলাদেশের জন্য শুভ নয়। কারণ "প্রকল্প সাহায্য" বিশেষ প্রকল্পে সীমাবদ্ধ থাকে বিধায় সাহায্য ব্যবহারে বাংলাদেশ সরকারের কোন স্বাধীন নমনীয়তা থাকে না।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিদেশী সাহায্যে অনুদানের অংশ কমে এসে হয় ১২.১ শতাংশ। বিদেশী সাহায্যে প্রকল্পের অংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৮.৮ শতাংশ ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত পাঁচ অর্থ বছরে অর্জিত বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি ৫৪.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে বৈদেশিক সহায়তার ছাড়করণের পরিমাণে ২৩.১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি ৯.৭১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বৈদেশিক সহায়তার ছাড়করণের পরিমাণ ৬.২০ বিলিয়ন মার্কিন ডালার যা স্বাধীনতার পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

বৈদেশিক সাহায্যের সমালোচনাসমূহ

বাংলাদেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহানের গবেষনা থেকে বিদেশী সাহায্যের কুফলগুলো বিস্তৃত জানা যায়। সেগুলো হচ্ছে:

ক. বাংলাদেশের অ-জনপ্রিয় সরকারগুলো সস্তা বিদেশী সাহায্যের দ্বারা বহুদিন টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে। সামরিক সরকার এর প্রকৃষ্ট উদাহরন।

খ. অনেক গণতান্ত্রিক সরকারও সস্তা বিদেশী সাহায্যের কারণে অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে কঠোর নীতি অনুসরন করেন নি। যখন ধনীক শ্রেণীর থেকে কর আরোপ করে সম্পদ সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল, অথবা অপ্রয়োজনীয় সরকারী ব্যয় হ্রাস করার কথা ছিল, তখন তারা বিদেশী সাহায্য দিয়ে সরকারী আয়-ব্যয় ঘাটতি অনায়াসে পূরণ করেছে এবং কঠোর কিন্তু প্রয়োজনীয় নীতিগুলো গ্রহণ করে নি।

গ. যেহেতু বিদেশী সাহায্য সরকারের মাধ্যমে বন্টন হতো সে জন্য এই সম্পদ এর ভিত্তিতে আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব যথেষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়ে। ফলে দূর্নীতি ও অর্থনৈতিক অবৈধ সুবিধার বিনিময়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সমর্থন সৃষ্টির কুপ্রথা চালু হয়েছে।

খ. বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেট, আমদানি, সরকারের আয়, সব কিছুই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় "দাতাদের" চাপ প্রদান ক্ষমতা প্রচুর পরিমানে বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের অর্থনৈতিক দর্শন অনিচ্ছুক সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই ধরনের চাপ দিয়ে দাতারাও তাদের সুপারিশ বাস্তবায়নে শেষ পর্যন্ত সক্ষম হয়নি।

ঙ. বিদেশী সাহায্যের অধিকাংশ সুফল অপেক্ষাকৃত ধনী শহরবাসীর ভাগ্যে বর্তিয়েছে। অবশ্য দাতা গোষ্ঠী "বিদেশী সাহায্যের" উপরোক্ত নেতিবাচক সমালোচনাগুলো প্রত্যাখান করে বলেন যে অন্তত: ৩টি ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্যে সুফল লক্ষ্যণীয়।

১. খাদ্য সাহায্য না আসলে দেশে দুর্ভিক্ষ হতো।
২. বিদেশী সাহায্য ভিত্তিক "জনসংখ্যা সংকোচন কর্মসূচি" বাংলাদেশে খুবই সফলভাবে জনসংখ্যার হার কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এবং
৩. কৃষি উপকরণ বন্টন এবং শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটিয়ে বিদেশী সাহায্য "ব্যক্তি মালিকানা" ও পরীক্ষিত "বাজার পদ্ধতির" সূচনা ঘটিয়েছে।

যদিও দাতারা স্বীকার করেন যে বিদেশী সাহায্যের বড় অংশই ব্যয় হয়েছে পুঁজি ঘন শহরে প্রকল্প গুলোতে ক্ষুদ্র অংশই পেয়েছে দরিদ্র জনগণ, রপ্তানিমুখী শিল্পায়নে আশানুরূপ অগ্রগতি হয় নি এবং আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও জটিলতার ফলে বিদেশী সাহায্যের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়নি, কিন্তু এরপরেও তারা এ জন্য বিদেশী সাহায্যকে দায়ী করেন না। তাদের মতে এই কুফলতার জন্য দায়ী স্থানীয় শাসকদের সুশাসনের অভাব।

সামগ্রিকভাবে আমরা বলতে পারি যে বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তা হওয়া উচিত শর্তহীন এবং তার ব্যবহারিক কার্যকারিতা সর্বদাই নির্ভর করবে ক্ষমতাসীন সরকার বা গ্রহীতা এজন্টদের চরিত্রের উপর।

বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তা হওয়া উচিত শর্তহীন এবং তার ব্যবহারিক কার্যকারিতা সর্বদাই নির্ভর করবে ক্ষমতাসীন সরকার বা গ্রহীতা এজন্টদের চরিত্রের উপর।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় বাণিজ্য ঘাটতি অথবা সঞ্চয় ঘাটতি পূরনের জন্য। ১৯৮০-র দশকে গড়ে বৈদেশিক সাহায্যের বাৎসরিক পরিমাণ ছিল জি.ডি.পি-র ৮ শতাংশ। ৯০ দশকে তা তিন থেকে চার শতাংশে নেমে এসেছে। যদিও অর্থনৈতিক ভাবে পরনির্ভরতা কমেছে, নীতিগত ক্ষেত্রে বা অর্থনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রভাব সংযোগ বর্তমানে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশী সাহায্যের গতি-প্রবনতা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এতে অনুদানের হার ক্রমাগত কমেছে, দ্বিপাক্ষিকতার বদলে বহুপাক্ষিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্প সাহায্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলো সবই বাংলাদেশের জন্য শুভ হয় নি। বৈদেশিক সাহায্যের কুফলগুলো সমালোচকরা তথ্য-প্রমানসহ বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু দাতা গোষ্ঠীর মনে করেন এর পরেও বিদেশী সাহায্য না আসলে বাংলাদেশের যেটুকু মঙ্গলকর উন্নতি হয়েছে (যেমন, দুর্ভিক্ষের আবসান, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের নিম্নগামী প্রবনতা এবং "সঠিক অর্থনৈতিক নীতিমালার" প্রবর্তন) সেটুকুও হতো না। তবে দাতারা বৈদেশিক সাহায্য যে বহুল 'পরিমানে ব্যর্থ হয়েছে তা স্বীকার করেন কিন্তু সে জন্য তারা স্থানীয় রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের দুর্বলতাকেই মূলত: দায়ী করেন। বস্তুত: শর্তহীন বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে এবং সকল অবস্থাতেই বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকারিতা নির্ভর করবে স্থানীয় গ্রহীতা সরকার/এজেন্টের চরিত্রের উপর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১। বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়-

ক. সঞ্চয় ঘাটতি পূরনের জন্য; খ. বাণিজ্যিক ঘাটতি পূরণের জন্য;

গ. সঞ্চয় ঘাটতি বা বাণিজ্যিক ঘাটতি পূরনের জন্য।

২. বাংলাদেশে আশির দশকে বাৎসরিক বৈদেশিক সাহায্যের গড় পরিমান ছিল -

ক. জি.ডি.পি-র ১০ শতাংশ; খ. জি.ডি.পি-র ৮ শতাংশ;

গ. জি.ডি.পি-র ৪ শতাংশ;

৩। বাংলাদেশের ৯০ দশকে বাৎসরিক বৈদেশিক সাহায্যের গড় পরিমান ৮০-দশকের তুলনায়-

ক. কমেছে (জি.ডি.পি-র শতাংশ হিসাবে);

খ. বেড়েছে (জি.ডি.পি-র শতাংশ হিসাবে);

গ. সমান রয়েছে (জি.ডি.পি-র শতাংশ হিসাবে)।

৪। বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে অনুদানের অংশ সময়ের সাথে সাথে-

ক. বেড়েছে; খ. কমেছে;

গ. একই রকম ছিল।

৫। বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে দ্বিপাক্ষিকভাবে প্রাপ্ত সাহায্যের অংশ কালক্রমে ক্রমশ -

ক. বেড়েছে;

খ. কমেছে;

গ. একই রকম ছিল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. বৈদেশিক সাহায্য কেন দরকার হয়।

২. বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকারিতা কিসের উপর নির্ভর করে?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. "বৈদেশিক সাহায্য একটি প্রয়োজনীয় বিপজ্জনক বিষয়"-ব্যাখ্যা করুন।

২. বৈদেশিক সাহায্যের সম্ভাব্য কুফলগুলো বর্ণনা করুন।

৩. "বৈদেশিক সাহায্যের" সম্ভাব্য সুফলগুলো বর্ণনা করুন।